

মাসুদ রানা

সীমা লঙ্ঘন

বাংলা ভাষায় প্রথমবারের



সীমা লঙ্ঘন

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

আম্মান এয়ারপোর্ট। সোমবার, রাত সাড়ে বারোটা।

ট্রাক থেকে নামিয়ে বিশাল কার্গোপ্লেন হারকিউলিসে বড় আকৃতির কন্টেইনার তোলা হচ্ছে। হারকিউলিসের এটা নিয়মিত সাপ্তাহিক ফ্লাইট, গন্তব্য তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা। রফতানিযোগ্য পণ্য তেমন কিছু নেই জর্দানের, বিভিন্ন দেশ থেকে সস্তায় কিনে এনে সেগুলোই অন্যান্য দেশে কিছু বেশি দামে বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। আজকের ফ্লাইটে বাংলাদেশী কিছু পাটজাতদ্রব্য তুরস্কে পাঠাচ্ছে তারা।

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার আগে ইসরায়েলি আকাশ পার হতে হবে পাইলটকে, আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। ঢাকা থেকে আসা একটা কন্টেইনারে চটের ব্যাগ থাকার কথা, কিন্তু তা নেই, তার বদলে ভেতরে বসে আছে বিসিআই-এর তিনজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ব্যাগ বের করে ভেতরে মানুষ ঢোকানো হয়েছে একটা অয্যারহাউসে জর্দানী ইন্টেলিজেন্সের সহায়তায়।

বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান স্বয়ং ওদেরকে ব্রিফিং করেছেন। প্রথমেই তিনি জানিয়ে দেন, 'ধরে নিতে পারো এটা ওয়ান-ওয়ে-জার্নি। কে ফিরতে পারবে বলা যায় না। সেজন্যেই স্বেচ্ছাসেবক হতে বলা হচ্ছে তোমাদের।'

বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সেই মীটিঙে উপস্থিত ছিল নয়জন এজেন্ট, সবাই তারা হাত তোলে। বাছাই করা হয় মাত্র দু'জনকে—মেজর শেখ শামিম আর মেজর সৈয়দ হাসান। মাসুদ রানাকে হাত তুলতে হয়নি, কারণ রাহাত খান আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ওর নেতৃত্বেই দলটাকে ইসরায়েলে পাঠানো হবে।

অ্যাসাইনমেন্টের নাম 'শান্তি মিশন'। মোট সদস্য সংখ্যা ছয়। বাকি তিনজনের নাম শাফি, নাসের আর রিয়াজ। জর্দান-ইসরায়েলি সীমান্তের কাছাকাছি ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে থাকে ওরা, প্রত্যেকে হিবুল্লাহ মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্য, প্যালেষ্টাইনের নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, ইসরায়েলের ভেতর তৎপর উগ্রপন্থী ফিলিস্তিনীদের গোপন সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এদেরকে মিশনের সদস্য করা হয়েছে লেবানিজ ইন্টেলিজেন্স চীফ-এর সুপারিশে। সময়ের অভাবে বিসিআই এজেন্টরা এদের সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানার সুযোগ পায়নি। একই কৌশলে হারকিউলিসে উঠবে তারা, কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবে। পাইলট আর কো-পাইলট জর্দানী, মোটা টাকা পুরস্কার পাবে ওরা এ কাজের জন্যে। কার্গো প্লেন ভূমধ্যসাগরে পৌঁছুবার এক

কি আধ মিনিট আগে ইসরায়েলের উপকূল সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় প্যারাস্যুটের সাহায্যে নেমে যাবে মিশনের সদস্যরা। উপত্যকায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সদস্যদের রিসেপশন কমিটি।

তারা ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে একজন জেলের কাছে। লোকটার নাম ফায়েদ। সে জানে ইসরায়েলের তিনটে সাবমেরিন কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রানার নেতৃত্বে মিশনের কাজ হবে ওগুলোকে আগামী বুধবার দুপুরের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া। তা না হলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন।

আগুন নিয়ে এই ভয়াবহ খেলাটা শুরু করতে যাচ্ছে মোসাড, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স।

ইসরায়েল সরকার আশা করেছিল, আনসকম-এর সাহায্যে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাকের বায়োলজিকাল, কেমিকেল ও নিউক্লিয়ার স্থাপনাগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু ইরাক জাতিসংঘের আদেশ অমান্য করে বাটলার সহ আনসকম-এর সব সদস্যকে দেশ থেকে বহিস্কার করায় তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। আমেরিকা ও ব্রিটেন ইরাক আক্রমণ করলেও, তাতে সাদ্দামের তেমন ক্ষতি হয়নি, বিশ্ব জনমতেরও সমর্থন পাওয়া যায়নি। এরকম পরিস্থিতিতে ইসরায়েল সরকারকে এক টিলে একাধিক পাখি মারার একটা বুদ্ধি যোগায় মোসাড। সরল একটা প্ল্যান, সফল হলে ইসরায়েল তো বটেই, অস্ত্র প্রস্তুতকারক পশ্চিমা বিশ্বও যার-পর-নাই উপকৃত হবে।

ইরাকের কুদীপ্রধান এলাকায় ইসরায়েলের অনেক চর আছে, তারা কয়েকটা মোবাইল রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে সৌদি আরব আর কুয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে পনেরো দিন পর মধ্যরাতে। সেটা এমনভাবে প্রচার করা হবে, সবাই যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারে যুদ্ধটা ইরাকই ঘোষণা করেছে। তার আগে, ওই দিনই দুপুর একটায়, ইসরায়েলের উপকূলে লুকিয়ে রাখা তিনটে সাবমেরিন রওনা হবে। গন্তব্য জানা যায়নি, শুধু জানা গেছে মাঝরাতে মোবাইল রেডিওতে ইরাকের নামে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরপরই সাবমেরিনগুলো থেকে ঝাঁক ঝাঁক কনভেনশনাল ও অরহেডসহ মিসাইল ছোঁড়া হবে। মিসাইলগুলো এমন এক দিক বা গতিপথ ধরে আসবে, সৌদি ও কুয়েতি রেডারে দেখা যাবে ইরাক থেকেই আসছে ওগুলো।

ওই দুই দেশের প্রতিক্রিয়া হবে তাত্ক্ষণিক, তারাও আমেরিকার সাহায্য নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করবে ইরাককে। এভাবে একটা গোলমাল শুরু করে দেয়া গেলে সিরিয়া, জর্দান ও মিশর সহ অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলোও জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধে। এক পর্যায়ে ফলাফল দাঁড়াবে, ইসরায়েলের চারপাশে শক্তিশালী প্রতিবেশী আর একটাও থাকবে না। ইতোমধ্যে যুদ্ধরত আরব দেশগুলোকে অস্ত্র আর গোলাবারুদ সরবরাহ করে কয়েক হাজার বিলিয়ন ডলার কর্ম্মিয়ে নেবে আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। অস্ত্র বিক্রির এই সুযোগ পাওয়ায় উন্নত বিশ্ব ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র যদি ধরতেও পারে, টু-শব্দটি করবে না, বরং মৌন সমর্থন জানাবে।

ইসরায়েলের পরম মিত্র আমেরিকা। মোসাড-এর সঙ্গে সিআইএ আর পেন্টাগনের গলায় গলায় ভাব। ঠিক অনুমোদন লাভের জন্যে নয়, বরং আনন্দটা

ভাগাভাগি করে উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই প্ল্যানটা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া হয় সিসআইএ ও পেট্যাগনকে। ওই দুই প্রতিষ্ঠান নির্লিপ্ত থাকবে বলে কথা দেয়, তবে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে ব্যাপারটা অবহিত করে। হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা লিক হয়নি, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সতর্ক করে দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইহুদি, তিনি কংগ্রেসের শক্তিশালী ইহুদি লবিকে এত বড় একটা সুখবর না জানিয়ে থাকতে পারেননি। ওই বিশেষ মহল বা গ্রুপটি অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠায় কংগ্রেস সদস্য মিস লরেলি ভ্যান্স কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এবং নানান কৌশলে মোসাদের গোটা প্ল্যানটা জেনে নেয়।

খবরটা জেনে বিবেকের দংশনে ক্ষতিবিক্ষিত হতে থাকে লরেলি। ইরাকের কুয়েত আক্রমণ সে সমর্থন করেনি, তবে বার্তাগতভাবে বিশ্বাস করে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করছে ইরাকের জনসাধারণ। তাছাড়া, শুধু অস্ত্র বিক্রির জন্যে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ঘোর বিরোধী সে। চব্বিশ ঘন্টা গুম মেরে থাকার পর স্যাটেলাইট টেলিফোনের মাধ্যমে লন্ডনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানাকে তথ্যটা জানায় সে; জানতে চায়, এই অবস্থায় ওর কি করা উচিত বলে মনে করে ও।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে লরেলিকে কয়েকটা দিন চুপচাপ অপেক্ষা করতে বলে বিসিআই চীফ রাহাত খানকে সব জানিয়ে মেসেজ পাঠায় রানা। সংবাদটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নেন বস। রানাকে ডেকে পাঠান ঢাকায়।

রানা ঢাকায় পৌঁছার পর ছয়দিন পার হয়ে গেছে। কি ঘটছে জানে না ও, শুধু টের পাচ্ছে অত্যন্ত ব্যস্ত বিসিআই চীফ, মীটিঙের পর মীটিং হচ্ছে সাততলার অফিস রুমে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের রাষ্ট্রদূতের ব্যস্ত আনাগোনা হচ্ছে, ঝড়ের বেগে সাঙ্কেতিক মেসেজ আসছে-যাচ্ছে।

সোহেলের কাছ থেকেও তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। কাজেই এই কটা দিন চুটিয়ে আড্ডা মারল রানা অফিসের পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, নতুন যারা এসেছে তাদের বৈধে নিল সখ্যতার বান্ধনে। অনেকদিন পর চা-নাস্তা-গুলতানিতে মেতে উঠল গোটা অফিস।

তারপর হঠাৎ রবিবার সকালে জরুরী মীটিং ডাকলেন রাহাত খান। ব্রিফিঙে তিনি যে সব তথ্য ও নির্দেশ দিলেন, শুনে রানা যেমন বিস্মিত হলো, তেমনি ভয় পেল।

এই কদিন বিসিআই বসে ছিল না। সরেজমিনে খবর সংগ্রহ করার জন্য গত মঙ্গলবার একজন এজেন্টকে পাঠানো হয় ইসরায়েলে। সঙ্গে ছিল হিয়বুল্লাহ গেরিলাদের একটা দল। প্রতি আট ঘন্টা পরপর রেডিও মেসেজ পাঠাবার কথা ছিল। নিরাপদে নামার পর কোড-করা মেসেজ পাঠায় সে, কিন্তু তারপর হঠাৎ আর কোন খবর নেই। স্বভাবতই আশঙ্কা করা হয়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেছে তারা। তারপর হঠাৎ কাল, অর্থাৎ শনিবার রাতে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর একজন সদস্য একটা রেডিও মেসেজ পাঠায়, জানায় শেফাইম শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্বে পাহাড়ী একটা গ্রামে গোলাগুলি হয়েছে। তাতে মারা পড়েছে বেশ কিছু লোক। বিসিআই ঢাকা হেডকোয়ার্টার ধরে নেয় মিশনের সদস্যদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়েছে। মেসেজটা কোড করা ছিল না। অপারেটরের

হাতে সময় হয়তো কম ছিল। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুডে মোসাদের চর ঢুকে পড়েছে।

কাঠের প্রকাণ্ড কন্টেইনারে কোন ফাঁক বা ফুটো নেই, ভেতর দিকটা ফোম দিয়ে মোড়া, বাতাসের অভাব মেটাচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডার। কন্টেইনারের ভেতর একটা রেডিও আছে, পিঠে বইবার জন্যে স্ট্যাপ লাগানো। আর আছে পিতল দিয়ে মোড়া দুটো বাস্ক। একটাতে আছে জেলিগনাইট বা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। দ্বিতীয়টায় প্রাইমার ও টাইম পেন্সিল। ছোট একটা চামড়ার ব্যাগে রয়েছে দশ হাজার মার্কিন ডলার, সবই বিশ ডলারের নোট। এই টাকা জেলে ফায়েদকে দিতে হবে।

প্রত্যেকের পিঠে প্যারাসুট প্যাক রয়েছে। হাতে উজি মেশিনগান। কন্টেইনার ভেঙে প্লেনের কার্গো হোল্ডে বেরুবার আগে টর্চ জ্বলে তামার তার ভরা রশির দুটো কুণ্ডলী আর ব্যাগে রাখা ক্লাইসিং গিয়ার পরীক্ষা করল রানা। তরঙ্গপর হ্যাভারস্যাকে আরও কয়েকটা গ্রেনেড ভরে নিল।

প্লেনের সাইড ডোর বন্ধ করে গ্রাউন্ড ক্রুরা মই বেয়ে নেমে যেতেই কন্ট্রোল কেবিন থেকে একটা বোতামে চাপ দিল পাইলট, কন্টেইনারের ভেতর একটা বেল বেজে উঠল। বোয়ানেট দিয়ে ফোম আর কাঠ কেটে কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

প্রথমে বেরুল মেজর শামিম। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ছাতি, অসুরের শক্তি গায়ে, বয়স ছাব্বিশ। ঋজু হয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে পাথুরে মূর্তির অটল দৃঢ়তা। হাতে ছুরি থাকলে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারে সে। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। কথা বলে কম, গম্ভীর স্বভাব।

তারপর বেরুল মেজর হাসান। এ-ও, শামীমের মতই, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে নতুন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, হালকা-পাতলা কাঠামো, তবে পেশীবহুল শরীর, বয়স সাতাশ। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট, গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে। চেহারায় বেপরোয়া একটা ভাব, যেন কারও নির্দেশ মানতে রাজি নয়। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে সব সময়।

কন্টেইনারের ভেতর থেকে ওদেরকে কাভার দিচ্ছিল রানা। প্লেনে মোসাদ কোন ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, সেজন্যেই ওর এই অতিরিক্ত সাবধানতা। টাকা থেকে বলা হয়েছে, সম্ভবত মুসলিম ব্রাদারহুড পেনিট্রেট করেছে মোসাদ। কিন্তু হিবুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

সময়ের অভাবে হিবুল্লাহ গেরিলা শাফি, নাসের আর রিয়াজের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি ওদের। তবে ওদের ফটো দেখেছে, জানে, পরিচয় দেয়ার সময় কি কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করবে। চিহ্নিত একটা কন্টেইনারে আছে ওরা, তবে ওদের কন্টেইনারে রিমোট কন্ট্রোল অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। সাদৃশ্যিক টোকা না শোনা পর্যন্ত কন্টেইনার ভেঙে বাইরে বেরুবে না ওরা।

ইঙ্গিতে শামিম আর হাসানকে পজিশন নিতে বলল রানা। লাল রঙে ছাতা আঁকা রয়েছে একটা কন্টেইনারে, সেটার দু'পাশে অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়াল ওরা। সাদৃশ্যিক টোকা দিল রানা : ঠক-ঠক, ঠক, ঠক-ঠক-ঠক

পিঠে প্যারাস্যুট প্যাক, হাতে অস্ত্র, কন্টেইনার ভেঙে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে ওরা।

‘একজন একজন করে,’ শান্ত, ঠাণ্ডা সুরে নির্দেশ দিল রানা। ‘প্রত্যেকের আইডি চেক করব আমি। তারপর কোড ওয়ার্ড শুনব। আমি মাসুদ রানা।’

প্রথমে বেরুল সুদর্শন এক যুবক। ‘আমি শাফি।’ বুক পকেট থেকে আইডি কার্ড বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। রানা সেটা পরীক্ষা করেছে, আবার বলল, ‘আমার কোড ওয়ার্ড পীস টক। জী, আমাকে বলা হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টে মাসুদ রানাই আমাদের লীডার।’

আইডি কার্ডে শাফির ছবি আছে, কোড ওয়ার্ডও নির্ভুল উচ্চারণ করেছে সে। ‘তুমি এই মিশনে কি কাজে লাগবে, শাফি?’ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, ঠোটে হাসি। শাফির বয়েস হবে বড়জোর পঁচিশ।

‘ইসরায়েলি উপকূলে আমি কাজ করেছি, গোটা এলাকা আমার চেনা,’ জবাব দিল শাফি।

‘কাজ করেছ মানে?’

‘আমাকে স্নাগলারও বলতে পারেন, মুসলিম ব্রাদারহুডকে মাঝে মধ্যে গোলাবারুদ সাপ্লাই দিই। সাইপ্রাস থেকে মদ আনি...’

তাকে একপাশে সরে দাঁড়বার ইঙ্গিত দিল রানা। কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয়জন। ‘আমি নাসের।’ ফর্সা, দীর্ঘদেহী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বয়েস ত্রিশের কোঠায়। ‘আমার কোড ওয়ার্ড—পীস কমিটি। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করছি, মেজর রানা।’

‘ধন্যবাদ।’ আইডি থেকে চোখ তুলে তাকাল রানা, চোখে প্রশ্ন।

‘আমি জেরুজালেমেই ছিলাম,’ বলল নাসের। ‘পরিবারের সবাইকে রেখে অক্সফোর্ডে পলিটিকাল সায়েন্স পড়তে যাই। ওখানেই বিয়ে করি, তারপর বউকে নিয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসি। ফেরার পর জানতে পারি পশ্চিম তীরে নেতানেয়াহু সরকার ইহুদিদের জন্যে নতুন বসতি তৈরি করার জন্যে আরও অনেক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারকেও এলাকা থেকে উচ্ছেদ করেছে। উচ্ছেদের সময় অনেকে বাধা দেয়, তাদের মধ্যে আমার দুই ভাই আর বাবাও ছিলেন। তিনজনকেই ইসরায়েলি মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে। আমাকেও গ্রেফতার করা হবে শুনে বউকে নিয়ে পালিয়ে আসি হাইফায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় বউকে হারিয়ে ফেলি। এক পর্যায়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাহায্য চাই। ওরা আমাকে সীমান্ত পেরুতে সাহায্য করে। জর্দানে এসে হিযবুল্লাহ গেরিলা দলে যোগ দিই। হিযবুল্লাহ আর ব্রাদারহুডের মধ্যে লিয়াজোঁ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।’

‘আপনার স্ত্রীর কোনও খবর?’

‘শুধু জানি সীমান্ত পেরিয়ে জর্দানে আমার কাছে আসার চেষ্টা করেছে লায়লা। ব্রাদারহুডের লোকজন আমাকে জানিয়েছে, ও তাদের ইনফর্মার হিসেবে কাজ করেছে।’ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নাসের জানতে চাইল, ‘আপনারা হিব্রু জানেন কি?’

মিথ্যে কথা বলার সময় রানার চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। ‘না।’

‘আপনারা কেউই হিব্রু জানেন না?’ নাসের বিস্মিত, উদ্ভিগ্ন ও বটে। ‘ইসরায়েলি সেনা ও নৌ-বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য নিজেদের মধ্যে হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বলে।

‘প্রয়োজন হলে আপনারা কথা বলবেন,’ বলল রানা। ব্রিফিংয়ের সময় রাহাত খান বার বার সাবধান করে দিয়েছেন, কাউকে বিশ্বাস করবে না।

‘শাফি গাইড, নাসের লিয়াজোঁ অফিসার, আর তুমি?’ তৃতীয় লোকটা, অর্থাৎ রিয়াজ, কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে আসতে জিজ্ঞেস করল রানা। তার আইডি কার্ড যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষা করল ও। তারপর চোখ তুলে খুঁটিয়ে দেখল রিয়াজকে। শামিমের মতই বিশালদেহী সে, হাতগুলো অস্বাভাবিক লম্বা আর পেশল। বয়েস হবে বাইশ কি তেইশ।

‘আমার পাস ওয়ার্ড প্রমিজড ল্যান্ড। মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য, রেডিও অপারেটর হিসেবে কাজ করেছি।’ কন্টেইনারের ভেতর থেকে বড় আকৃতির একটা নুটকেস বের করল সে। ‘এতে কয়েক গ্রন্থ ইসরায়েলি সেনা ও নৌ-বাহিনীর ইউনিফর্ম আছে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যাবে।’

হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘আর তিন মিনিট পর পাইলট এঞ্জিন স্টার্ট দেবে। আকাশে ওঠার পর ইসরায়েলি উপকূলে পৌঁছতে বিশ মিনিটও লাগবে না। সবাই এখন তৈরি হয়ে নিন। পাস ওয়ার্ড-ইস্রাফিল ও আফলাতুন।’

‘ইয়েস, স্যার!’ রানাকে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালাউট করল রিয়াজ।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে প্লেন থেকে লাফ দিয়েছে ওরা। প্রকাণ্ড ভেজা একটা হাতুড়ির মত রানাকে আঘাত করল জমিন। শরীরটা গড়িয়ে দেয়ার সময় চোখে প্রায় ছোবল মারল টর্চের আলো। একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো, ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল মাথা। প্যারাসুট খুলে মুক্ত করল নিজে, চারদিকে এখন জমাট অন্ধকার। উজি মেশিনগানটা বাগিয়ে ধরে সেফটি ক্যাচ অফ করল, মাটির সঙ্গে লেণ্টে লম্বা হয়ে আছে, কোণঠাসা পশুর মত প্রতিটি পেশী টান টান। এক মুহূর্ত শুধু বাতাসের গোঙানি আর বৃষ্টির আওয়াজ শোনা গেল, মুখের একপাশের চামড়ায় ঝোঁচা দিচ্ছে কাকর। তারপর কাছ থেকে একটা গলা ভেসে এল, ‘ইস্রাফিল।’

‘আফলাতুন,’ বলল রানা।

অকস্মাৎ হেঁচ-চেক করে উঠল একসঙ্গে বহু লোক, পাঁচ-সাতটা টর্চের আলো পড়ল চোখে। উজির ব্যারেল নিচু করল রানা। কেউ একজন চেষ্টা করে উঠল আরবীতে, ‘বেদখল প্যালেষ্টাইনের পুণ্যভূমিতে স্বাগতম! মুসলিম ব্রাদারহুড জিন্দাবাদ! হিব্রুলাহ জিন্দাবাদ! স্বাগতম! স্বাগতম! মান্যবর লীডার, আমাদের সবার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন!’

প্রয়োজন নেই, তবু কয়েক জোড়া হাত উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ওকে। ‘বাকি সবাই কোথায়?’ জানতে চাইল ও।

‘সবাই নিরাপদে নেমেছে।’ রানার হাতে একটা ফ্লাস্ক ধরিয়ে দেয়া হলো। ‘কফি পান করুন। ইহুদি মৌলবাদ নিপাত যাক!’ ফ্লাস্ক খুলে দুই টোক কফি খেলো রানা। ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যে গরম হয়ে উঠল শরীর। আশপাশের লোকজন সিগারেট ধরাচ্ছে। গাড়ি একটা মূর্তি উদয় হলো ওর পাশে, এক মুহূর্ত পর আরেকটা।

হাসানের গলা পেল রানা, 'এ কোথায় এসে পড়লাম, মাসুদ ভাই? এরা এত হৈ-চৈ করছে কেন?'

'আমরা কি সবাই এখানে আছি?' জিজ্ঞেস করল রানা। কেউ একজন জবাব দিল, আছি। সব মিলিয়ে অনেক বেশি মানুষ, বড় বেশি' শোরগোল, শৃঙ্খলা বা সাবধানতা একেবারেই অনুপস্থিত। 'নাসের?'

'ইয়েস, মি. রানা!'

'রিসেপশন কমিটির লোকদের চুপ করতে বলুন। রিয়াজকে সুটকেসটা আনতে বলুন ফায়েদ কোথায়?'

আরবীতে ফিসফাস কথাবার্তা হলো। নাসের চাপা গলায় অসন্তোষ প্রকাশ করল। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'নেতানায়া, উপকূল শহরে অটাকা পড়েছে ফায়েদ,' জবাব দিল নাসের। 'গত হুগুয় আপনাদের এক অফিসারের নেতৃত্বে হিববুল্লাহদের একটা দল প্যারাসুট নিয়ে এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে নামে, তাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যদের গোলাগুলি হয়েছে। ইসরায়েলিরা কড়া পাহারা বসিয়েছে চারদিকে। ওরা খুব নার্ভাস।'

রানা ভাবল, দলটা তাহলে এখনও ধরা পড়েনি। 'হতাহত?'

'কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

'ফায়েদের কাছে যাবার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রানা। রিয়াজ তার সুটকেস খুলে দিতেই ব্যস্ত হাতে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরতে শুরু করল রানা, শামিম ও হাসান।

'নেতানায়া শহরটা পরবর্তী উপত্যকায়। ট্রাক এলে আমরাই নিয়ে যাব আপনাদের,' বলল নাসের। 'রিসেপশন কমিটির লোকজন বলছে, ট্রান্সপোর্ট নিয়ে খানিকটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। তবে, ট্রাক একটা আসবে। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ব্রাদারহুডের এরা প্রফেশন্যাল নয়, আবেগতাড়িত আনাড়ী...'

'ওদেরকে শাস্ত হতে বলুন, আর জিজ্ঞেস করুন ট্রাক আসতে কতক্ষণ লাগবে।'

আবার আরবীতে কথা বলল নাসের। 'ওরা অপেক্ষা করতে বলছে, মি. রানা। নেতানায়া এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। পথে মিলিটারি হয়তো টহল দিচ্ছে। ওরা পাহাড়ী একটা গুহা চেনে, জায়গাটা শুকনো। ইসরায়েলি সৈন্যরা ওদিকে যায় না। ওরা বলছে অপেক্ষা করার জন্যে ওই গুহা নিরাপদ। ট্রাকটা আমাদের নিতে আসবে এক কি দু'ঘন্টার মধ্যে।'

হাতঘড়ির ভেজা ডায়ালে চোখ রাখল রানা। সোমবার, রাত দেড়টা। বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের মাথায় অপেক্ষা করতে বলা হচ্ছে, অথচ বুধবার দুপুর একটায় রওনা হয়ে যাবে ইসরায়েলি সাবমেরিন। 'গুহাটা কোথায়?'

শাফি জবাব দিল, 'আমি চিনি।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। দৈর্ঘ্য ধরতে হবে। 'চলো তাহলে।' তারপর নির্দেশ দিল, 'আমাদের ছাড়া কাপড়চোপড় সুটকেসে ভরতে বলুন।'

মেজর শামিম পাশে এসে দাঁড়াল। 'লক্ষণ ভাল নয়,' বিভ্রিবিড় করল সে। 'এত

লোকের কোন প্রয়োজনই ছিল না, মাসুদ ভাই। মিশন গোপন রাখা অসম্ভব।’

‘নাসের,’ বলল রানা। ‘ওদেরকে চুপ করতে বলুন।’

কঠিন ভাষায় ধমক দিল নাসের। লোকজন চুপ মেরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে শুরু করল সবাই। সবার আগে রয়েছে শাফি, বড় সুটকেস আকৃতির অসংখ্য বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোচ্ছে সে। পাথরগুলো পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে। ওরা যে ম্যাপ দেখে এসেছে, সেটা নির্ভুল ছিল—পাহাড়ের ঢালগুলো এত খাড়া নয় যে প্রাচীর বলা যাবে। পিছন থেকে নাসেরের উত্তেজিত গলা পাচ্ছে রানা, আঞ্চলিক আরবী ভাষায় কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে। এত দ্রুত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নাসেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করল ও। শত্রু এলাকায় বেঁচে থাকতে হলে প্রথম শর্ত শাস্ত্র থাকা। নাসের ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে। পিছন ফিরে নরম সুরে বলল, ‘শাট আপ।’

চুপ করে গেল নাসের। মিছিলটাও শাস্ত্র হয়ে গেল।

‘ওর রাগের কারণটা কিছু বুঝতে পারলে?’ হাসানকে প্রশ্ন করল রানা।

‘কার যেন আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি।’

দশ মিনিট পর উপত্যকার মেঝে সফল হয়ে একশো গজে দাঁড়াল, ঢাল অদৃশ্য হয়েছে, তার বদলে খাড়া পাহাড়-প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় মাইন বা বিস্ফোরক ফাটিয়ে গভীর গর্ত তৈরি করা হয়েছে, আলকাতরার মত কালো ছায়ায় লুকানো। ‘এখানে,’ অন্ধকার থেকে শাফির গলা ভেসে এল। কেউ একজন টর্চের আলো ফেলায় গর্তটার মুখ দেখা গেল।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল শামিম। ‘বিপজ্জনক জায়গা,’ বলল সে। গর্ত বা গুহা থেকে শুধু উপত্যকায় বেরুনো যায়, অন্য কোন পথ নেই। আর উপত্যকাটাকে গভীর খাদ বলাই ভাল। শামিমের সঙ্গে রানাও একমত—জায়গাটা একটা ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে।

‘নাসের,’ ঘাড় না ফিরিয়েই ডাকল ও। ‘কমিটির লোকদের বলুন এই জায়গা নিরাপদ নয়।’

নাসের কথা বলছে না।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। ‘নাসের, ওদেরকে বলুন...’ থেমে গেল ও। কমিটির কোন লোকজনকে দেখা যাচ্ছে না। ধূসর পাথরের গায়ে নিঃসঙ্গ একটা গাঢ় মূর্তি নাসের।

‘ওরা চলে গেছে,’ বলল সে।

‘চলে গেছে?’

‘দেখতে গেছে ট্রাকটা আসছে কিনা। তাছাড়া, ওদের সঙ্গে আরেকজনের থাকার কথা ছিল, সে না আসায় আমি ধমক দিয়েছি, তাই...’

‘থামুন!’ চাপা গলায় ধমক দিল শামিম।

কেউ যেন বোতাম টিপে নাসেরের মুখ বন্ধ করে দিল। শামিম আর হাসানকে রানা বলল, ‘এখন আর প্ল্যান বদল করা সম্ভব নয়। ট্রাকটা আমাদের দরকার। এই জায়গা ছেড়ে সরে গেলে ওরা আমাদের খুঁজে পাবে না। কাতার নাও।’

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল শামিম ও হাসান। গুহার ভেতর নয়, পজিশন নিচ্ছে বোল্ডারের আড়ালে।

রাতটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। বৃষ্টি প্রায় ছেড়ে গেছে, তবে বাতাসের হাহাকার থামেনি। নতুন একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। গুহার ভেতর থেকে আসছে। ব্যা-ব্যা করছে কয়েকটা ছাগল, গলার ঘণ্টাগুলো বেজে উঠছে মাঝে মাঝে।

চিন্তা করছে রানা। আয়োজনে মারাত্মক ত্রুটি রয়ে গেছে। মুসলিম ব্রাদারহুড এতটা বিশৃঙ্খল, কল্পনাও করা যায় না। তাছাড়া, মেজর নাহিদের নেতৃত্বে প্রথম মিশন এদিকের পরিবেশ আগে থেকেই উত্তপ্ত তন্দুর করে রেখেছে। ইসরায়েলি সৈন্যরা এখন যদি উপত্যকায় উঠে আসে, পালাবার কোন পথ নেই ওদের।

আবার বৃষ্টি শুরু হলো। কান পাতল রানা। হু-হু বাতাস বইছে। ছাগলের গলায় টুং-টুং ঘণ্টা বাজছে। আরেকটা আওয়াজ! যান্ত্রিক, তবে মোটরের নয়। ঘষা খাওয়ার শব্দ, কাঁচকাঁচ করছে। কাঁকরের ওপর ঢাকা গড়ানোর আওয়াজ। একটা সাইকেল আসছে।

অন্ধকারে দু'চাকার বাহনটাকে কেউ ওরা দেখতে পাচ্ছে না। শুধু শব্দ শুনে শামিম বুঝতে পারল, তাকে পাশ কাটাচ্ছে ওটা। আড়াল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপ দিল সে। ভারী বস্তার মত পড়ে গেল কেউ। ছিটকে পড়ল সাইকেল। পিছনের চাকা শূন্যে ঘুরছে, ধীরে সে আওয়াজও থেমে গেল। অন্ধকারে একটা ঘুঘু ডেকে উঠল। কি আশ্চর্য, ভাবল রানা, পাহাড়ের ওপর এই বৃষ্টির মধ্যে ঘুঘু আসে কোথেকে?

রানার বাম কাঁধের কাছে প্রকাণ্ড কিছু একটা নড়ে উঠল। শামিম। 'এটা পেলাম,' বলে দু'হাতে ধরা ভারী কিছু রানার সামনে পাথুরে মাটিতে ফেলে দিল সে। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল, আবার ঘুঘুর ডাক নকল করল ক্রেউ, এটা অন্য রকম সুরে।

শামিম বস্তু নয়, একটা মানুষ ফেলেছে। ব্যথা পেয়ে গোঙাচ্ছে সে। উজির মাজলটা তার কানে ঠেকাল রানা। 'চুপ!'

মাটিতে পড়া মানুষটা চুপ করে গেল।

রানা জানতে চাইল, 'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

উজির ব্যারেলটা ঠেলে সরিয়ে দিল মানুষটা। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, 'নাসের!'

'ও আল্লাহ!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। সাইকেলে চড়ে কোন পুরুষ নয়, একটা মেয়ে এসেছে।

উঠে বসতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় হাত চালাল মেয়েটা। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, কনুইয়ের গুঁতো আর ঘুসি একহাতে সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। 'খবরদার, গায়ে হাত দেবেন না!' হিসহিস করে বলল মেয়েটা।

বৃষ্টির মধ্যে নাসেরের গলা ভেসে এল, 'সত্যি তুমি? লায়লা?' বুটের শব্দ ছুটে আসছে।

'ওহু, নাসের!' এক লাফে সিঁধে হলো মেয়েটা, পরমুহূর্তে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

লায়লা ফোঁপাচ্ছে। নাসেরের চোখেও পানি, কিন্তু অন্ধকারে তা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। জীব পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে, রানাকে বলল, 'আমার আপনজন

বলতে এই একজনই বেঁচে আছে। এ আমার স্ত্রী, লায়লা...

‘একেই আপনি খুঁজছিলেন?’

‘হ্যাঁ। লায়লা পৌঁছে গেছে, কাজেই এখন আর কোন চিন্তা নেই। এলাকার মুসলমানদের সবাইকে চেনে ও। আমরা ভাগ্যবান, ও আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে।’
ফিসফাস শুরু করল ওরা দু’জন। অধৈর্য হয়ে উঠল রানা, তা সত্ত্বেও অপেক্ষা করছে।

‘নতুন কোন তথ্য?’ এক মিনিট পর জানতে চাইল।

‘লায়লা বলছে ষাটজন ইসরায়েলি সৈন্য উপত্যকায় উঠে আসছে।’

‘তিনটে ট্রাক,’ বলল লায়লা। ‘শেফাইমের পূর্ব প্রান্তে রিসেপশন কমিটির দু’জনকে ধরেছে ওরা, প্যারাসুট সহ।’

‘কতক্ষণ আগে?’

‘আধ ঘণ্টা। বাকি সবাই পালাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা। ওরা আপনাদেরকে সাবধান করে দিতে বলল।’

রানার তলপেটে শিরশিরে অনুভূতি হলো। মাত্র এক ঘণ্টা হলো ইসরায়েলে নেমেছে ওরা, এরইমধ্যে ভেসে যেতে বসেছে অপারেশন। চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল ও। ‘শাফি?’

অক্ষকার থেকে পাশে এসে দাঁড়াল শাফি। এক সেকেন্ডের জন্যে টর্চ জ্বালল।
‘লায়লা। কেমন আছ?’ মেয়েটাকে দেখে এতটুকু অবাক হয়নি সে।

‘ভাল, শাফি।’

পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। শুনে শাফি বলল, ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৈকতে পৌঁছানো উচিত আমাদের। জেলে নৌকা নিয়ে পালাতে হবে। অপারেশন বেঁচে গেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাণ বাঁচানোটাই ফরজ কাজ।’

রানা কল্পনার চোখে দেখছে পেল কুয়েত আর সৌদি শহরগুলোয় ঝাঁক ঝাঁক ইসরায়েলি মিসাইল আঘাত করছে। এয়ারপোর্ট, সেনাছাউনি, হাসপাতাল, এতিমখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কুয়েতে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য আছে, তাদের কি অবস্থা হবে বলা কঠিন। তবে ইরাক আক্রমণকারী, এই অজুহাতে কুয়েতে মোতায়ন করা আমেরিকান সৈন্যরা অবশ্যই ইরাকে ঢুকে পড়বে। একই সঙ্গে শুরু হবে বিমান হামলা। চব্বিশ ঘণ্টাও পেরুবে না, গোটা মধ্যপ্রাচ্য রক্তাক্ত রণাঙ্গন হয়ে উঠবে। ও জানতে চাইল, ‘অন্য কোন উপায় নেই?’

‘নাহ্,’ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল শাফি। ‘নিমাক-এর কথা আমি ধরছি না।’

‘কি সেটা?’

‘কিছু না। পাহাড়ী একটা পথ, শুধু ছাগল আসা-যাওয়া করে। উপত্যকার তলা থেকে পাহাড় পৌঁচিয়ে উঠেছে। সে বহুকাল আগের কথা, তীর্থযাত্রীরা প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে ওই পথে আসা-যাওয়া করত, তারপর এক সময় ডাকাতরা ওই পথে পালাত। অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ। ভুলেও আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। ডাকাতদের হাতে যত লোক খুন হয়েছে, ওই পথ থেকে খাদে পড়ে তারচেয়ে বেশি

লোক মারা গেছে।’

‘কোনদিকে ওটা?’

অন্ধকার আকাশের গায়ে শাফিকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখা গেল। ওপর দিকে আঙুল খাড়া করল সে। ‘পাহাড়ের শিরদাঁড়ায়। উপত্যকার এখান থেকে তিনশো মিটার ওপরে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়। কয়েকটা বাঁক ঘুরে নেতানায়ার দিকে নেমেছে। নেতানায়ায় তীর্থযাত্রীদের জন্যে একটা সরাইখানা আছে। কিন্তু উপত্যকার গোড়ায় নামা সম্ভব নয়, স্যার।’

‘কেন?’

‘ওখানে ইসরায়েলি সৈন্য গিজগিজ করছে...’

‘আমরা পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে ওপরে উঠব,’ এমন শান্ত সুরে বলল রানা, যেন পার্কে হাঁটার প্রস্তাব দিচ্ছে।

এক সেকেন্ড পর মুখ খুলল শাফি, ‘নিমাক-এ পৌছানোর জন্যে? তা সম্ভব নয়, স্যার।’

‘যেহেতু প্রয়োজন, অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে।’

রানার দৃঢ়, ঠাণ্ডা সুর এক মুহূর্ত চুপ করিয়ে রাখল শাফিকে। তারপর সে মাথা নেড়ে বলল, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না, স্যার। এদিকের পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।’

‘তোমার মত ইসরায়েলি সৈন্যরাও তাই ভাববে। হাসান?’

একটা বোল্ডারে এসে আছে হাসান। সে জানে রানা কি বলতে যাচ্ছে। নার্ভাস ফিল করছে সে। ‘বলো, মাসুদ ভাই।’

‘সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করো। শামিম আর আমি পাহাড়ের মাথায় উঠে তোমাদের জন্যে একটা রশি নামাব। তোমাকে দেখতে হবে, সবাই যেন ওঠে।’

মাথার হেলমেট পিছনে ঠেলে দিয়ে ওপর দিকে তাকাল হাসান। ইহাৎ মনে হলো যেন একটা টানেলে রয়েছে। তারপর, অনেক উঁচুতে, সচল মেঘ দেখা গেল, ফলে নিরেট ও গম্ভীরদর্শন একজোড়া পাহাড়-প্রাচীরের মাঝখানে ফিতের মত সরু এক ফালি আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠল। উপত্যকায় তীব্র বাতাস বইছে। ট্রাকের কোন আওয়াজ আসছে না। দীর্ঘকায় গাঢ় কাঠামো, রানা, তারে জড়ানো রশির একটা মস্ত কুণ্ডলী কাঁধে ফেলে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে হাঁটছে। দ্রুত, সাবধানে, নাসের আর লায়লাকে কাছে ডেকে নিল হাসান; রেডিও অপারেটর রিয়াজ আর শাফিকে নির্দেশ দিল রসদ-পত্র সব এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। ‘সতর্ক করে দিল, রেডিও আর বিস্ফোরকের বাস্র দুটোর কথা যেন না ভোলে।

নিরেট পাথরের গায়ে শামিম আর রানা যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি নিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় বসে থাকল ওরা। ওপর থেকে মাঝে মধ্যে ফিসফাস কথাবার্তা আর স্পাইকে হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজ ভেসে আসছে, পেরেক লাগানো বুট ঘষা খাচ্ছে পাথরে। শব্দগুলো দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে।

কান পেতে আছে হাসান। এটা একটা বিপজ্জনক মুহূর্ত। এখন যদি কোন হামলা আসে, দলটা দু’ভাগ হয়ে যাবে। দাঁড়াল সে, উজির সেফটি ক্যাচ অফ করে উপত্যকার মেঝে ধরে পঞ্চাশ গজের মত হেঁটে গেল। একজনের অন্তত পাহারায়

থাকা উচিত। আর উপত্যকার মেঝেতে হাসান শুধু হাসানকেই বিশ্বাস করতে রাজি।

কপালে অচেনা, বিশৃঙ্খল, আবুগতাদিত সঙ্গী-সাথী জুটলে কি ঘটে?

কি আবার, বিপদ। কাজেই ঘটজন ইসরায়েলি সৈন্য সত্যি আসছে কিনা দেখার জন্যে তৈরি থাকতে হবে তাকে।

খাড়া প্রাচীর, ভেজা ও পিচ্ছিল, তা-ও চোখে প্রায় দেখাই যায় না। মসৃণ পাথরের গায়ে নগ্ন আঙুল আর বুট পরা পা বুলিয়ে খুঁজে নিতে হচ্ছে ফাটল, ফাঁক বা গর্ত। চুলের মত সরু ফাটলে স্পাইক ঢোকাতে হচ্ছে, আধ ইঞ্চি বা তারও কম চওড়া খোজে বুটের ডগা ঠেকিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়। শীত আর বৃষ্টির মধ্যেও যেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে রানা।

পঞ্চাশ ফুট ওঠার আগেই দুই হাতের সবগুলো নখ ভেঙে গেল। তিন ট্রাক ইসরায়েলি সৈন্য এদিকে আসছে, নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দেয়ায় কোন ব্যথা অনুভব করছে না। খানিক পর একটা চিমনি পেয়ে গেল ও।

চিমনি বলতে পাহাড়ের গায়ে পাথরের প্রকাণ্ড এক বাড়তি টুকরোর কিনারা, কয়েকশো বছরের মধ্যে পাহাড়-প্রাচীরের গা থেকে নিচের খাদে নিঃশেষে খসে পড়বে। এখানে রশি আটকাল রানা, নিচে শামিমের উদ্দেশে ডাক দিল, তারপর চিমনিটা ধরে এত দ্রুত উঠতে শুরু করল যেন সিঁড়ি ভাঙছে।

প্রথম ত্রিশ ফুট খাড়া, তারপর বাম দিকে বাঁকা হতে শুরু করল চিমনি। বাধাটা অকস্মাৎ চোখে পড়ল, বিশাল একটা বোল্ডার পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে, পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে চিমনিটা। বোল্ডারটা চিমনিতে আটকে যাওয়ায় সমতল একটা মেঝে তৈরি হয়েছে, দু'পাশ থেকে পাথুরে অবলম্বন আলিঙ্গন করে আছে মেঝেটাকে, উপত্যকা থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। স্বপ্নেও ভাবেনি রানা এরকম একটা নিরাপদ জায়গা পাওয়া যাবে। পঞ্চাশজন লোক অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে এখানে, উপত্যকা চষে ফেললেও তাদের অস্তিত্ব টের পাবে না ইসরায়েলি সৈন্য। পাহাড়-প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে তারা ধরে নেবে চূড়ায় উঠে অপরপ্রান্তের ঢাল বেয়ে সৈকতে নেমে গেছে ওরা, জেলেদের নৌকো নিয়ে পালিয়ে গেছে।

রশি বেয়ে প্রথমে উঠে এল শাফি। ভারী, চৌকো রেডিও প্যাকটা নিয়ে এল সে। কয়েক মুহূর্ত পর শামিম পৌঁছল, কাঁধে রশির দ্বিতীয় কুণ্ডলী। রিপোর্ট করল, 'চিমনির গোড়ায় সবাই পৌঁছে গেছে, রসদ সহ।'

'গুড,' বলল রানা। রশিটা বাঁধল, অপরপ্রান্তটা ফেলে দিল নিচে।

নিচের দিকে এখন একজোড়া রশি ঝুলছে, ফলে খুব দ্রুত উঠে আসছে বাকি সবাই। রিয়াজ পৌঁছল হাঁপাতে হাঁপাতে, ভয়ে শুকিয়ে গেছে চেহারা, ষ্ট্রি হ্যাটটা ভুরুর কাছে নেমে এসেছে। অনেকক্ষণ হলো দ্বিতীয় রশি ধরে কেউ উঠছে না। 'মেয়েটা, লায়লা না কি যেন নাম,' বলল শামিম। 'হাতে জোর নেই।' রশির দিকে ঝুঁকে পড়ায় আকাশের গায়ে তার বিশাল পিঠ ঝুঁকতে পাচ্ছে রানা। মেয়েটা অসম্ভব লম্বা-চওড়া, দেড় মণের কম হবে না। কিন্তু শামিম তাকে ধরে এমন ভঙ্গিতে তুলে আনল, মেয়েটা যেন তুলো দিয়ে তৈরি একটা পুতুল।

‘ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করল লায়লা, গরম কাপড়ের ওপর জড়ানো কম্বলের মত মোটা চাদরটা দিয়ে শরীরটা ভাল করে ঢেকে নিচ্ছে।

শামিমের চওড়া গোফের নিচে সাদা দাঁত দেখা গেল। ‘ইউ আর ওয়েলকাম।’ কে বলবে এই লায়লাকেই ভারী বস্তার মত কাঁকরের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছিল সে।

এরপর উঠল নাসের। এত ক্লান্ত যে অভিযোগ করার দম নেই। তবে লায়লাকে খুঁজে নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। সামান্য হলেও উদ্ভিগ্ন বোধ করল রানা। স্ত্রীকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে নাসের, অথচ অপারেশনটাই তার প্রথম গুরুত্ব হওয়া উচিত। মেয়েটা সম্পর্কে কিছুই রানার জানা নেই। নাসের সম্পর্কেও খুব কম জানে ও। মূল্যবান একটা তথ্য দিয়ে, তথ্যটা যদি সত্যি হয়, মেয়েটা ওদের বিরাট উপকার করেছে। কিন্তু রানার ইসটিংক্ট যদি মিথ্যে না হয়, অপারেশনে বিশ্রী একটা বাধা বা উপদ্রব হয়ে দেখা দেবে মেয়েটা।

নাসেরের ওপর নজর রাখতে হবে—মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

ওদের দিকে পিছন ফিরে বিস্ফোরকের বাস্তু দুটো সহ আরও একজোড়া প্যাক টেনে তুলল রানা। বৃষ্টির ফোঁটা বরফের মত ঠাণ্ডা লাগছে হাতে আর মুখে। ইতিমধ্যে রসদ তোলার কাজ শেষ হয়েছে, সব জড়ো করে রাখা হয়েছে বোল্ডারের কিনারায়। সবশেষে উঠছে হাসান, কিন্তু এখনও তার জন্যে কোন রশি ফেলা হয়নি।

বাতাস থেমে থেমে গোঙাচ্ছে। শামিম হঠাৎ ফিসফিস করল, ‘মাসুদ ভাই! শোনো!’

ট্রাক এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ, পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

চল্লিশ ফুট ওঠার পর মসৃণ পাথরে আঙুল আটকাবার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না হাসান। নিচের শূন্যতা যেন ছোবল মারছে পায়ে, হিম বাতাস সারাক্ষণ ঝাপটা দিয়ে গেলেও ইউনিকর্মের ভেতর গরম ঘামের নায়েখা বয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকিয়ে না, তাকালেই পড়ে যাবে, নিজেকে সাবধান করে দিল সে। কিন্তু ওপর থেকে রশি ফেলা হচ্ছে না কেন ওরা? রশি ছাড়া চিমনিতে সে উঠবে কিভাবে? পাথরে মুখ ঠেকাল, পারলে ভেতরে সঁধিয়ে যায়। উপত্যকায় পৌঁছে গেছে ট্রাকগুলো, হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রাচীর।

পাথরের ওপর হাত বুলাচ্ছে হাসান। কর্কশ পাথর, কিন্তু আঙুল আটকাবার মত কিছু নেই। নিচে নামা সম্ভব নয়, ওপরে ওঠাও সম্ভব নয়, কাজেই এখানেই স্থির হয়ে বুলে থাকো।

পায়ের নিচে আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। গোটা খাদ ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজে ভরাট হয়ে আছে। ওপর থেকে একটা গলা ভেসে এল, ‘রশি নামছে!’

ট্রাকগুলো এখন সরাসরি তার নিচে। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, হাটা-গতিতে এগোচ্ছে ওগুলো। তব্বাশী চালাচ্ছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। মুখ তুলে ওপরে কেউ তাকাচ্ছে না। কেন তাকাবে? এ তো ঢাল নয়, খাড়া পাঁচিল।

রশিটা ঘষা খেলো মুখে। হাসান কৃতজ্ঞচিত্তে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। রশি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

বোল্ডারের সমতল মেঝে থেকে শামিম বলল, ‘হাসান উঠছে।’

চওড়া কার্নিস বা মেঝের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা ! মেঝের কিনারা এই মুহূর্তে দিগন্তরেখার মত, হেডলাইটের আলোর আভাষ আলোকিত । কিনারায় শব্দ, নিরেট ও চারকোনা একটা কাঠামো স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে । রেডিওটা ।

‘ওটা সরাও,’ রিয়াজকে নির্দেশ দিল রানা ।

‘ইয়েস, স্যার!’ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ডদেহী রিয়াজ । ও ক্লান্ত, বুঝতে পারছে রানা । শুধু ক্লান্ত নয়, ভয়ও পাচ্ছে; ভেজা স্ট্রিট হ্যাটটা মাথা থেকে নামাবার কথা মনে নেই ।

রানা নিজেও ক্লান্ত, তা না হলে এরপর যা ঘটল সেটা ঠেকাতে পারত ।

রেডিওটা তুলে কাঁধে ঝোলাল রিয়াজ । ঘোরার সময় কিছু একটায় আঘাত করল তার পা । আলোর ক্ষীণ আভাষ রানার চোখে জিনিসটাকে ঘাসের চাপড়া বলে মনে হলো, কিন্তু আসলে একটা পাথর । পাথরটা কিনারা থেকে খসে পড়ল ।

বাতাসে আলোড়ন তুলে হাসানের মাথাকে পাশ কাটাল ওটা । চিমনির গোড়ায় আঘাত করল, খসিয়ে ফেলল মাঝারি আকারের একটা বোল্ডার । ওগুলোকে অনুসরণ করল ছোটখাট একটা পাথর ধস । কনভয়টার দ্বিতীয় ট্রাকের পনেরো ফুট ডানে সগর্জনে ছিটকে পড়ল ওগুলো । ছোট কয়েকটা পাথর আঘাত করল ক্যাব-এর প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজায় ।

ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ল । ছাদ থেকে একটা সার্চলাইট সাদা থালা আকৃতির আলো ফেলল কালো পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ।

বোল্ডারের সমতল মেঝের কিনারা থেকে পনেরো ফুট নিচে রয়েছে হাসান, দরদর করে ঘামছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে । রশি বেয়ে এখনও উঠছে সে । নিচ থেকে চিংকার ভেসে এল । ছাঁৎ করে উঠল বুক । পাথরের গায়ে হাত দুটো ধূসর রঙের মাকড়সার মত লাগছে দেখতে, এ যেন অন্য কারও হাত । তারপর অকস্মাৎ হাত দুটোকে নিজের বলে চিনতে পারল সে, চিনতে পারল হাতে ধরা তামার তার জড়ানো রশি । নিজেকে একটা পোকার মত লাগছে, সার্চলাইটের আলো পেরেকের মত গাঁথে রেখেছে ।

একটা রাইফেল গর্জে উঠল । তারপর আরেকটা । চুরমার হওয়া পাথর আঘাত করল মুখে । পিঠের পেশী কিলবিল করছে গুলি খাবার আশঙ্কায় । আর দশ ফুট উঠতে হবে । দশ মাইল বললেও চলে ।

ঠিক এই সময় ওপর থেকে মেশিনগানের এক পশলা গুলি হলো । সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল সার্চলাইট । পরমুহূর্তে হাতে ধরা রশিটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, ওপর থেকে টান দিয়ে তুলে নিচ্ছে কেউ । মুখ তুলে তাকাতে প্রকাণ্ড একটা কাঠামো দেখতে পেল সে, কাঁধ দুটো ফুলে ফুলে উঠছে । শামিম ।

শামিম এমন অনায়াসে তুলল তাকে, তার ওজন যেন দুশো পাউন্ড নয়, দুশো আউন্স । কিনারায় উঠে শরীরটা গড়িয়ে দিল হাসান, নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে উজ্জিটা কাঁধ থেকে নামাল ।

বোল্ডারের পরে পাহাড়-প্রাচীরের গা উজ্জ্বল সাদা । আলোর আভাষ হাসান দেখল উজ্জির সেফটি ক্যাচ অফ করছে রানা ।

‘গ্রেনেড চার্জ করো,’ বলল রানা । ‘আমি তোমাদের কাভার দিচ্ছি ।’

হাসান আর শামিম বেল্ট পাউচ থেকে দুটো করে গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলল।

‘ওয়ান...টু...থ্রী,’ বলল রানা, ‘থ্রো!’

নিস্তরুতার ভেতর নিঃশব্দে গ্রেনেডগুলো নেমে যাচ্ছে—একজোড়া ডান দিকে, আরেক জোড়া বাম দিকে। গোটা জগৎ যেন দম আটকে রেখেছে। নিচে ওরা মর্টার বসাবে; এই মুহূর্তে পজিশন নিচ্ছে, রেডিও অন করে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে বলছে। তবে এত গভীর খাদ থেকে রেডিও মেসেজ পরিষ্কার শোনা যাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তারপর সাদা হয়ে গেল রাত, চারটে বিস্ফোরণের শব্দকে একটা মনে হলো, পরমুহূর্তে আরও জোরাল একটা আওয়াজ শোনা গেল। ক্রল করে কার্নিসের কিনারায় চলে এল রানা। নিচের আলোগুলো নিভে গেছে। তবে নতুন একটা আলো দেখা যাচ্ছে, কালো আর কমলা রঙের—একটা ট্রাকে আগুন ধরে গেছে, বিস্ফোরিত হয়েছে পেট্রল ট্যাংক। গুলি থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু হলো।

‘এবার শামিম কভার দাও, দশ মিনিট। তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে চূড়ায়।’

আগুনের আভায়ে দেখা গেল রানার নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকাল শামিম, কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে ছড়ানো পাথরের ভেতর দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি পাঁচজন পুরুষ আর লায়লা প্যাকগুলো তুলল। গলায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, শাফি বলল, ‘সবুজ একটা পথ পাওয়া যাবে। আরেকটু উচুতে।’

‘হাসান,’ বলল রানা, ‘আমি চাই না ট্রাকগুলো ফিরে যাক। তোমার কিছু করার আছে?’

‘নেই আবার!’ নিঃশব্দে হাসল হাসান। তামার পাত দিয়ে জড়ানো একটা বাস্কের ভেতর এরইমধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। দশ ইঞ্চি ইঁটের মত দেখতে পাঁচ পাউন্ড ওজনের প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বের করে মেঝেতে রাখল। প্রথম বাস্ক বন্ধ করে দ্বিতীয় বাস্ক খুলল। স্বক-এর বুক পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে জ্বালল। সবুজ একটা টাইম পেন্সিল বেছে নিল বাস্ক থেকে, খারটি সেকেন্ড ডিলে। পেন্সিলটা সাবধানে প্রাইমারে ঢোকাল, তারপর আলোকিত হাতঘড়ির ডায়ালে তাকাল। পেন্সিলে ক্যাপ পরিয়ে হাই তুলল, সিগারেট ধরাল সাবধানে। লাইটারটা পকেটে যখন ভরল, পঁচিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। ইঁটটা দু’হাতে ধরে কিনারা থেকে ফেলে দিল নিচে, জোড়া ট্রাক লক্ষ্য করে।

দম ফেলে শ্বাস টানার সময়টুকু অন্ধকার আর নিস্তরু, শুধু নিচে থেকে হিব্রু ভাষায় অস্পষ্ট চিৎকার-চোঁচামেচি ভেসে আসছে, আর শোনা যাচ্ছে পাথরের সঙ্গে ইম্পাতের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ—মর্টার বসানো ওরা।

তারপর আবার সাদা হয়ে গেল রাত, সার্চলাইটের চেয়ে উজ্জ্বল, সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল বোল্ডারের মেঝে, ছিটকে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে পড়ল রানা, কানে তালা লেগে গেছে। ‘গো!’ চিৎকার করলেও, আওয়াজটা অস্পষ্ট শোনা কানে। পথ দেখিয়ে উঠছে ও, বাকি সবাই পিছু নিল। শাফির পিছনে লায়লা, তারপর নাসের, সবশেষে হাসান। একা শামিম শুধু পঞ্চাশ ডিগ্রী ঝাঁক নিয়ে বোল্ডারের পিছনে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, ওখানে আরও একটা বোল্ডার

পেয়েছে সে। উজিটা তেপায়ার ওপর রেখে নিচে, উপত্যকার মেঝেতে তাকাল।

দুটো ট্রাক জুলছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে উপত্যকার মেঝে, সেই ক্ষতের মধ্যে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন মানুষের শরীর ও ধাতব আবর্জনা। অপর ট্রাকটা দেখতে হয়েছে চিড়ে-চ্যাপ্টা খেঁতলানো পোকাকার মত। খাদের দূর প্রান্তে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে তিনজন লোক, পাশে ভাঙাচোরা একটা মর্টার। তিনজনের মধ্যে একজন নড়ে উঠল দেখে উজিটা কাঁধে তুলে ফায়ার করল শামিম। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা, তারপর আর নড়ল না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল শামিম। উপত্যকায় প্রাণের কোন অস্তিত্ব আছে বলে মনে হলো না। যতদূর বুঝতে পারছে, রেডিও সেটটা গুঁড়িয়ে গেছে। সৈন্যরাও সম্ভবত কেউ বেঁচে নেই। থাকলে নিচে নেমে তাদেরকে খুন করতে তার আপত্তি নেই। তবে সেক্ষেত্রে মূল দলের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না।

আবার বৃষ্টি শুরু হতে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল শামিম। এখানে আর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী হলে থাকা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় হাসান এত জোরে হাঁপাচ্ছে, শুধু ওই একটা শব্দই শুনতে পাচ্ছে সে। অন্ধকারে কোথায় পা ফেলছে দেখার উপায় নেই। একে প্রচণ্ড শীত, তার ওপর তুমুল বৃষ্টি। কোথায় যাচ্ছে, পরিষ্কার কোন ধারণা নেই কারও। লায়লার কথায় যদি ভরসা রাখা যায়, সামনে কোথাও ফায়ের ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে শুকনো, আরামদায়ক আশ্রয় মিলবে। কিংবা, কে জানে, হয়তো সরাসরি ফাঁদে পা দেবে ওরা।

রানা বলল, 'পিছনে নজর রাখা দরকার। কেউ থেকে যেতে পারে।'

শামিম একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পড়ল। শাফি ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর হাসান। এক সময় রিয়াজ। সবশেষে নাসের আর লায়লা। নাসের লায়লার ওপর ঝুঁকে আছে, স্ত্রীকে একরকম বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। 'আপনার অসুবিধে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল শামিম।

'না!' প্রয়োজনের চেয়ে চড়া গলায় জবাব দিল নাসের।

ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল শামিম। ওদের পিছু নিল সে।

যেন অনন্তকাল ধরে উঠছে ওরা। আসলে এক ঘণ্টার কিছু বেশি। আরও মিনিট পাঁচেক পর দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল শাফির গলা চিরে। সে কাউকে সঙ্কেত দিল, নাকি স্রেফ উল্লাস প্রকাশ করল, বোঝা গেল না।

সবার আগে ছিল রানা, আড়ষ্ট হয়ে গেল। শাফির অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। সামনের ঢাল প্রায় সমতল, যদিও অংশবিশেষ মাত্র। এটাই পথ। সামনে পাহাড়-চূড়ার উঁচু-নিচু চূড়া।

পিছিয়ে পড়েছিল নাসের আর লায়লা। শাফিকে থামার নির্দেশ দিল রানা। কাছে এসে নাসের বলল, 'লায়লা ক্লান্ত। ওর খিদে পেয়েছে, বিশ্রামও দরকার...'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' প্রতিবাদ করল লায়লা। দুর্বল কণ্ঠ, তবে গলায় জেদ প্রচুর।

'প্লীজ, লায়লা...'

‘ইস, কি করছ!’ হিসহিস করে বলল লায়লা। ‘চলো।’

রানা কিছু বলল না। মেয়েটার প্রাণশক্তির প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু তবু দুর্গম পাহাড়ী পথে একটা ঝামেলাই বলতে হবে, হাঁটার গতি খুবই কম। হাতঘড়ি দেখল ও। তিনটে বাজে। ‘শাফি, আর কত দূর?’

‘দু’ঘণ্টা। এখন শুধু নিচে নামা।’

‘তার আগে কোনও শেলটার নেই?’

‘দশ মিনিটের মধ্যে পাব একটা। রাখালদের কুঁড়ে। খালি পড়ে আছে।’

‘ওখানে আমরা বিশ মিনিট বিশ্রাম নেব,’ বলল রানা।

‘আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব...’ হাঁপাচ্ছে নাসের, কথাটা শেষ করতে পারল না।

কুঁড়েটায় ছাদ আর তিনদিকে দেয়াল আছে। শুকনো বিষ্ঠা ছড়ানো খড়ের গাদায় গুয়ে পড়ল লায়লা। খানিকটা খড় আলাদা করে আগুন জ্বালল নাসের। ব্যাগ থেকে কফি ভর্তি ফ্লাস্ক বের করল রিয়াজ। একবার টর্চ জেলে লায়লার চেহারাটা দেখে নিল রানা। মড়ার মত ফ্যাকাসে। রিয়াজের হাত থেকে ফ্লাস্কটা নিয়ে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। ‘নিম।’

লায়লার দাঁতের সঙ্গে ফ্লাস্কের মুখ বাড়ি খেলো। কেশে উঠল সে। ‘ধন্যবাদ।’

‘ভাগ্যই বলতে হবে আপনি আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছেন।’

‘শ্রেম। ভালবাসা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।’ আবেগে গলাটা বুজে এল নাসেরের।

‘তারচেয়েও বেশি কিছু,’ ছুরির মত ধারাল, ঠাণ্ডা সুরে বলল লায়লা। ‘নাসের, তোমার কোন ধারণা নেই কি ঘটতে যাচ্ছিল।’

‘ইয়েস?’ আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল রানা। ‘কি ঘটতে যাচ্ছিল?’

শিউরে উঠল লায়লা। তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ‘ওরা মুখ খুলেছে, মি. রানা। মুসলিম ব্রাদারহুডের দু’জন সদস্য। আমি অবশ্য মাত্র একজনকে চিনি। ইসরায়েলি সৈন্যদের ছাউনিতে ছিলাম আমি, ওরা আমাকে জেরা করার জন্যে আটকে রেখেছিল। আমার শারীরিক অবস্থা দেখে ওরা বলল, একটু পরই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তার একটু পরই পাশের অফিসরুমে ওদেরকে আমি দেখতে পাই। একজনকে চিনতে পারি। সে-ই কথা বলছিল। রেডিও মেসেজ এসেছে, আপনারা প্যারাসুট নিয়ে নামবেন। আপনাদের সঙ্গে প্রচুর টাকা থাকবে। সৈন্যদের সঙ্গে একটা রফা করে ওরা। স্রেফ ডাকাত, মুসলিম ব্রাদারহুডের সুনাম নষ্ট করছে। সৈন্যদের ওরা পরামর্শ দিল। আপনাদেরকে তারা খুন করবে। টাকাগুলো ওরা সবাই ভাগ করে নেবে। সেই সঙ্গে পাবে ইনফর্মারের চাকরি।’

‘তারপর?’ সামনে ঝুঁকল রানা।

‘ওরা সৈন্যদের বলল, কোথায় আপনারা ল্যান্ড করবেন। তাই ছাড়া পেতেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। ট্রাক আসেনি ওই দুই...’

লায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নাসের, ঝুঁকে চুমো খেলো কপালে।

‘ধন্যবাদ,’ বলে সিধে হলো রানা, ক্লাস্ত হাঁটু দুটোর প্রতিবাদ গ্রাহ্য করল না। দলে এরকম একটা মেয়ে থাকা ভাগ্যের কথা। হোক মন্ত্রগতি। ‘এখনি আমরা

রওনা হচ্ছি,' নির্দেশ দিল ও। মনে মনে আবারও বলল, নাসের আর ওর বউয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। এত সহজে ইসরায়েলিদের কজা থেকে ছাড়া পায় কি করে লায়লা? সম্ভব। ওদের নিজস্ব কোন কারণ থাকলে। নাকি দয়া? মন মানতে চায় না।

দুই

দু'ঘণ্টার পথ সোয়া এক ঘণ্টায় পেরিয়ে এল ওরা, ঢাল বেয়ে প্রায় ছুটে নেমে এসেছে। এই মুহূর্তে গাছপালার ভেতর রয়েছে ওরা, গ্রামের ওপরে। জঙ্গলে আরও একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, গোলাঘরের মত দেখতে। দরজা খুলে শাফি বলল, 'এখানে সবাই অপেক্ষা করুন।'

রানা ঝট করে তাকাল। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি দু'একজন বন্ধুকে খুঁজে পাই কিনা।' এদিকে তুমার পড়ে, তাই কুঁড়ের ভেতর একটা ফায়ারপ্রেস আছে, তাতে কয়েকটা চেলা কাঠ ভরে আগুন জ্বালল শাফি। 'আপনারা আরাম করুন, কাপড়চোপড় শুকিয়ে নিন।'

শামিমের দিকে তাকাল রানা। 'দু'জনের কেউই ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। তবে করারও কিছু নেই। এ এমন এক পরিস্থিতি, ভাল করে না চিনলেও লোকজনকে বিশ্বাস করতে হবে।'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল শাফি। আগুনের ধারে প্রায় ঢলে পড়ল লায়লা, পা থেকে বৃট খুলছে। তার দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিল রানা, 'বাইরে।'

অবাক হয়ে তাকাল লায়লা, রানাকে পাগল ভাবছে সে।

তার দৃষ্টির জবাবে রানা প্রশ্ন করল, 'শাফি যদি ইসরায়েলি সৈন্য নিয়ে ফিরে আসে?'

'শাফি? লায়লার চোখে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস। 'অসম্ভব! ইসরায়েলিদের ঘৃণা করে ও।'

নাসেরের ফর্সা চেহারা নীলচে-বেগুনি হয়ে আছে। 'কে বলতে পারে! ড্রপ সাইটে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ইসরায়েলিরা। তুমিই তো বললে, ব্রাদারহুডের দু'জন লোক বেঈমানি করেছে...'

'তাদেরকে আমি চিনতেও পেরেছি,' বলল লায়লা। 'কিন্তু তাই বলে শাফিকে সন্দেহ করার কোন মানে হয় না!'

'বাইরে অপেক্ষা করব আমরা,' রানাকে সমর্থন করে বলল নাসের।

লায়লার চেহারায় জেদ ফুটে উঠল। 'না! অসম্ভব! আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

'আমিও না,' বলল রিয়াজ। ঈ হ্যাটের নিচে তার প্রকাণ্ড মুখও নীলচে-বেগুনি হয়ে আছে।

‘মেয়েদের নিয়ে এই এক ঝামেলা...’

নাসেরকে থামিয়ে দিয়ে লায়লা বলল, ‘ঝামেলা মনে করলেই ঝামেলা। শাফিকে আমি চিনি, কাজেই...’ কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে...’ ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাতে গিয়ে নাসের দেখল শুধু রানা নয়, শামিম ও হাসানও কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেছে নিঃশব্দে। ভেজা পদচিহ্নগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে।

ভেজা পাইন কাঁটার ওপর শুয়ে শীতে হি-হি করছে হাসান। নাসেরকে ছুটে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে, দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে জঙ্গলের আরেক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি থেমে গেল। গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে পানির ফোঁটা ঝরছে। তারপর শোনা গেল এঞ্জিনের আওয়াজ। বাঁক ঘুরে ছোট একটা ট্রাক আসছে, তবে হেডলাইট জ্বলছে না। হাতের উজ্জি তুলে ট্রাক ক্যাবে লক্ষ্যস্থির করল হাসান। তিনজন লোক নামল নিচে। যত দূর বোঝা যাচ্ছে, হাফট্রাকটা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নয়। একটা গলা ভেসে এল, ‘ইস্রাফিল।’ অন্য কেউ একজন সাড়া দিল, ‘আফলাতুন।’ গোলাঘরের দরজা খুলে গেল।

রানা দেখল, জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে গোলাঘরের দিকে এগোচ্ছে নাসের। তারমানে নতুন আসা লোকগুলোকে সে চেনে। বসল রানা, সিধে হলো, সাবধানে এগোচ্ছে গোলাঘরের দিকে।

নতুন লোকগুলো আলখেল্লা পরে আছে, গরম চাদরে চোখ বাদে মুখ ও মাথা ঢাকা। প্রত্যেকের হাতে শটিগান। দু’জন অনর্গল কথা বলছে হিব্রু ভাষায়। শুধু উত্তেজিত নয়, আবেগে থরথর করে কাপছে।

‘থামে কোন ইসরায়েলি সৈন্য নেই,’ রানাকে বলল শাফি। ‘কিন্তু একটা দুঃসংবাদ আছে। শেফাইমের পূর্ব প্রান্তে গুলি খেয়েছে ফায়েদ।’

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। ‘কিভাবে?’

‘বেশি উৎসাহ দেখাতে গিয়ে,’ শাফির সংক্ষিপ্ত জবাব।

নাসের বলল, ‘সত্যি কথা বলতে কি, ভাল করতে গিয়ে নিজেও মরেছে ফায়েদ, আমাদেরকেও বিপদে ফেলে গেছে।’

শাফি কাঁধ ঝাঁকাল। ‘মুসলিম ব্রাদারহুডের মূল দল খবর পায় আমরা ল্যান্ড করেছে। তাদের ধারণা হয়, আমরা একটা রেজিমেন্ট, কিংবা তারও বেশি। এরকম ধারণার কারণ, খাদে মাত্র দু’জন সৈন্য বেঁচেছে। ফায়েদ খবর পায় ব্রাদারহুডের মূল দল ইসরায়েলি সৈন্যদের ছাউনিতে হামলা করতে যাচ্ছে। ওরা স্রেফ খুন হয়ে যাবে, বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়ার জন্যে রওনা হয় সে। কিন্তু পৌঁছতে দেরি করে ফেলে, তার আগেই ছাউনি আক্রমণ করে বসে ওরা। ইসরায়েলিরাও পাল্টা জবাব দিচ্ছিল। ব্রাদারহুডের বিশ-বাইশজন মারা গেছে, তাদের মধ্যে ফায়েদও একজন।’

রানা চিন্তায় পড়ে গেল। একমাত্র ফায়েদই জানত ইসরায়েলি সাবমেরিনগুলো কোথায় মেরামত করা হচ্ছে। ‘এখন তাহলে উপায়?’

‘নেতানায়ার গোফরান সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে,’ বলল শাফি।

‘গোফরান? গোফরান রুটিঅলা?’ জিজ্ঞেস করল নাসের। শাফি মাথা ঝাঁকাতে আবার বলল, ‘সৎ লোক।’

‘আমার রুটি নয়,’ শান্ত গলায় ধলিল রানা, ‘ইসরায়েলি তিনটে সাবমেরিন সম্পর্কে তথ্য দরকার।’

শাফি হাসল। ‘গোফরান রুটিঅলা আপনাদেরকে তার কাফেতে নাস্তা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ওখানে এক ভদ্রলোক আছেন, দেখলে খুশি হবেন, স্যার। সেই ভদ্রলোক আপনাকে হয়তো কিছু তথ্য দিতে পারবেন। কারণ তাব সঙ্গে ফায়েদের কথা হয়েছে।’

হয়তো! হাল ছেড়ে দেয়ার অবস্থা রানার।

‘ওহ, দারুণ,’ উৎসাহ দেখাল হাসান। ‘নাস্তা পাব, তথ্য পাব, চাইলে হয়তো নাচ-গানের ব্যবস্থাও...’

‘নাচ-গানের কথা জানি না, তবে গোফরান রুটিঅলা অনেক মেয়ে রাখে।’

হাসতে-গিয়েও রানার চোখে ধরা পড়ার ভয়ে হাসল না হাসান। ‘ও-সব আমাদের দরকার নেই, এমনি ঠাট্টা করছিলাম।’

ইশারায় শাফিকে কাছে ডাকল রানা। শাফির সঙ্গে আলখেল্লা পরা লোকগুলোও এগিয়ে এল, যেন শাফির গায়ে আঠা দিয়ে আটকানো। ‘গ্রামে ইসরায়েলি সৈন্য নেই কেন?’

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে এক লোক হাসল, ঝড়ের বেগে কথা বলে যাচ্ছে। শাফি ভাষান্তর করল; ‘সৈন্যরা সবাই শেফাইমের পূর্বে জমায়েত হয়েছে। তাদের ধারণা, পাহাড় টপকে নেতানায়ার দিকে আমরা আসতে পারিনি। ওরা সৈকতে তল্লাশী চালাচ্ছে।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ‘শোনো, শাফি। নাস্তার কথা ভুলে যাও। পরিবহনের ব্যবস্থা করো, অন্ধকার থাকতেই সৈকতে পৌঁছতে চাই আমরা। কি বলছি বুঝতে পারছ?’

‘হ্যা, কিন্তু...’

‘তোমার লোকজনকে গোফরানের কাছে ফেরত পাঠাও,’ কঠিন সুরে নির্দেশ দিল রানা, তারপর রিয়াজের দিকে তাকাল। ‘ওহে, জানোই তো, লেবাননে আমাদের লোক অপেক্ষা করছে। এবার তাকে জানাও আমরা পৌঁছেছি।’

মাথা ঝাঁকাল রিয়াজ। দেহটা প্রকাণ্ড হলে কি হবে, তাকেই সবচেয়ে ম্লান আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, চওড়া চোয়ালে ভাঁজ পড়ছে আর খুলছে, ঈ হ্যাটের কিনারা থেকে নেমে আসা কয়েকটা বুঁরি বাতাসে দুলছে। প্যাক খুলে রেডিওটা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। এক কোণে, ঝড়ের ওপর শুয়ে পড়েছে হাসান, গুনগুন করে দেশাত্মবোধক একটা গান গাইছে। শামিমের পেশী শিথিল হয়ে থাকলেও, দরজার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে বাইরেটা। দেয়ালে হেলান দিল রানা, আগুনের আঁচে শুকিয়ে গেছে ইউনিফর্ম।

‘এই গোফরান সম্পর্কে কি জানেন আপনি?’ নাসেরকে জিজ্ঞেস করল ও।

‘ফায়েদের সেকেন্ড ইন-কমান্ড,’ বলল নাসের। ‘ফায়েদকে আপনারা জেলে

বলে জানেন, আসলে সে হিববুল্লাহ-র সদস্য। গোফরানও তাই। দু'জনেই অসম্ভব সাহসী।’

‘আপনি বলছেন, গোফরানকে বিশ্বাস করা যায়?’

হাসল নাসের। ‘আর কোন বিকল্প আছে, মি. রানা?’

আবার বৃষ্টি শুরু হলো। রাহাত খান সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, যে-কোন শহর বা গ্রামে ঢোকার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে ওখানে ইসরায়েলি সৈন্য আছে কিনা। রানা চিন্তা করছে।

নিশ্চয়তা ভেঙে রিয়াজ বলল, ‘যোগাযোগ হয়েছে। মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘কোনও নির্দেশ?’ জিজ্ঞেস করল রানা। লেবাননে থাকার কথা বিসিআই-এর সহকারী ডিরেক্টর (অপারেশন্স) সোহেল আহমেদের, প্রয়োজন হলে সে ওদেরকে নতুন নির্দেশও দেবে।

‘না।’

চোখ বুজল রানা, পাতায় ঘুম হানা দিচ্ছে। সম্ভবত দু’মিনিটও হয়নি, অকস্মাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। বাইরে ট্রাক এঞ্জিনের ভারী গর্জন। উর্জি হাতে লাফ দিয়ে সিঁধে হলো ও, লক্ষ করল একপাশে দাঁড়িয়ে দরজাটা কাভার দিচ্ছে হাসান। শামিমকে গোলাঘরের কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় একজন লোক। লোকটা খাটো আর মোটা, চওড়া গোফের প্রান্ত দুটো চিবুক ছোঁয় ছোঁয়, কাকের কালো ডানার মত ছড়ানো, পরনে ঢোলা আলখেল্লা। উর্জির মাজল দেখে হাসল সে। ‘ভায়েরা! নেতানায়য় আপনাদেরকে স্বাগতম! ইস্রাফিল! আফলাতুন!’

রানা জিজ্ঞেস করল, ‘কে আপনি?’

‘গোফরান রুটিঅলা,’ বলল লোকটা। ‘বিপদ থেকে বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি আমার ট্রাকে উঠে পড়ুন।’ কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নত করল সে। ‘ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই।’

বাইরে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ এখনও অন্ধকার, তবে ঘন কালো মেঘের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। মিশনের সদস্যরা ট্রাকের পিছনে ওঠার পর তাদের মাথার ওপর ক্যানভাস টেনে দিল রানা, নিজে উঠে বসল ক্যাবে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রাক চালাচ্ছে গোফরান। ‘কাল রাতে আপনারা বিপদে পড়েছিলেন, সে রিপোর্ট আমি পেয়েছি। গত হপ্তা থেকে আপনাদের একজন এজেন্টের নেতৃত্বে হিববুল্লাহ গেরিলারা ইসরায়েলি সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে...’

‘আমাদের এজেন্ট মেজর নারিদ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারেন?’

‘তিনি মারা গেলে সবার আগে আমিই খবর পেতাম। ইসরায়েলি সৈন্যরা আমার কাছে আসে।’

‘আপনার কাছে আসে মানে?’

‘টোপ ফেলে রেখেছি না!’ হাসছে গোফরান। ‘আমার ডেরায় চলুন, গেলেই সব দেখতে পাবেন।’

রানা বলল, ‘আমরা তিনটে সাবমেরিনের খোঁজে এসেছি।’

‘জানি,’ বলল গোফরান। ‘আমি এক লোককে চিনি, সে আপনাদের ওগুলোর

কাছে নিয়ে যাবে। নাস্তার সময় তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে।' স্পীড কমিয়ে একটা ছাগলকে রাস্তা পার হবার সুযোগ দিল সে।

মালভূমি থেকে রাস্তায় নেমে এল ট্রাক। মাঝে মধ্যে দু'একটা ইঁট ও মাটির ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

'আমরা কি শহরে যাচ্ছি?'

'নেতানায়্য শহর বিপজ্জনক জায়গা। আমরা শহরের পাশে একটা গ্রামে যাচ্ছি, আমার আস্তানায়।'

একটা চার্চ ও মসজিদকে পাশ কাটাল ট্রাক। ওগুলোর মাঝখানে এক ঝাঁক মুরগি চরছে। তারপর এক সারি দোকান-পাট দেখা গেল। পাশাপাশি দুটো কামারশালা। কসাই-এর দোকানও আছে। চৌরাস্তায় পৌছুবার আগেই সাইনবোর্ডটা পড়তে পারল রানা-গোফরান কাফে। ট্রাক থামাল গোফরান। 'পৌছে গেছি। নামতে বলুন সবাইকে।'

ভেজা পাথুরে চাতালে ভারী আর কর্কশ শোনাৎল বুটের আওয়াজ। কাফের জানালার কাঁচে ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশের ইউনিফর্ম পরা তিনজন অফিসারের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, প্যাক আর উজি সহ। মুচকি হাসল রানা, আশপাশের জানালার পর্দা সামান্য ফাঁক করে যারা উকি-ঝুঁকি মারছে তাদের দৃষ্টিতে সিভিলিয়ানরা রানা, শামিম আর হাসানের বন্দী। কিন্তু কারা উকি দিচ্ছে? ইসরায়েলি সৈন্যরা নয়তো? এটা ফাঁদ হলে শ্রেফ খুন হয়ে যাবে ওরা।

বিনয়ে গদগদ ভঙ্গিতে পথ দেখিয়ে ওদেরকে কাফের ভেতর নিয়ে এল রুটিঅলা। কাউন্টারের পিছনে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি পর্দার ওপাশে কাঠের একটা আলমিরা দেখা গেল, সেটায় চাপ দিতে সিকি পাক ঘুরে গেল, বেরিয়ে পড়ল লুকানো সিঁড়ির মুখ। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় হাসানের নাকের ফুটো প্রসারিত হলো। 'আ-হা-হা! কফির গন্ধ পাচ্ছি!'

হাসান আগে আগে উঠছে, তার পিছনে রানা। ইঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল হাসান। উজির ট্রিগারে আঙুল পেঁচাল রানা। সিঁড়ির মাথায় চওড়া একটা ল্যান্ডিং, এখান থেকে চৌরাস্তার সবটুকু পরিষ্কার দেখা যায়। ল্যান্ডিংয়ে সোফা আর চেয়ার পাতা রয়েছে। চারপাশে অনেকগুলো দরজা। বাতাসে ঘাম, সস্তা সেন্ট আর সিগারেটের গন্ধ। হাসান বিড়বিড় করল, 'মাসুদ ভাই, এটা একটা ব্রুথেল।'

'সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারবেন,' জবাব দিল গোফরান।

বাইরে দিনের আলো এখন স্পষ্ট। 'আপনি বলেছেন এখানে একজন লোক আছে।' গোফরানের দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

মাথা ঝাঁকাল রুটিঅলা। 'আরও দু'ঘণ্টা পর তার ঘুম ভাঙবে। আগে নাস্তা খেয়ে নিন। আমার নিজের হাতে তৈরি...'

'আমরা এখন তার ঘুম ভাঙাব।'

কাঁধ ঝাঁকাল গোফরান, এগিয়ে এসে ল্যান্ডিংয়ের একটা দরজা খুলে দিল। ঘাম আর পারফিউমের গন্ধ বাড়ল আরও। দরজার ভেতর একটা বেডরুম, দেয়ালে কমলা রঙের নোংরা সার্টিন ঝুলছে। বিছানায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার শুয়ে রয়েছে, পেটে আর কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা। দেখেই মেজর

নাহিদকে চিনতে পারল রানা। ‘ওহু, গড!’ ফিসফিস করল ও।

চোখ মেলে শুঙিয়ে উঠল নাহিদ। তারপর রানাকে চিনতে পেরে উঠে বসার চেষ্টা করল। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে শুইয়ে রাখল রানা। ‘বস্ পাঠিয়েছেন তোমাদের? আমাকে উদ্ধার করার জন্যে?’ মাথা নাড়ল নাহিদ। ‘কোন দরকার ছিল না, মাসুদ ভাই। আমাকে খরচের খাতায় ধরে রাখতে পারো। তোমরা বরং দেখো সাবমেরিনগুলো খুঁজে পাও কিনা...’

মনে মনে শঙ্কিত রানা। নাহিদকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়, আবার সঙ্গে নেয়াও ভয়ানক বিপজ্জনক। ‘কি ঘটেছে, বলো তো আমাকে।’

‘রোডব্লকে ধরা পড়ে যাই,’ বলল নাহিদ। ‘ল্যান্ড করার কয়েক ঘণ্টা পরই। আমরা একটা জীপে ছিলাম। ইসরায়েলি সৈন্যরা জানত ওই রাস্তায় আসব আমরা। মেশিনগান চালায় ওরা, কিভাবে যে বেঁচে গেছি বলতে পারব না। হিবুত্সাহ গেরিলারা এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে আমাকে।’

‘উপকূলের কোথায় তুমি যাচ্ছিলে?’ জানতে চাইল রানা।

‘কেফার ভিটকিনে,’ ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ, কাতর কণ্ঠে বলল নাহিদ। ‘ওখানে এক লোক আছে, মোবারক। গোল্ড ফিশ নামে একটা কাফেতে। এ-সব তথ্য আমি ফায়েরদের কাছ থেকে পেয়েছি।’

‘আর কি জানো?’

‘সাবধানে যেতে হবে,’ বিড়বিড় করছে নাহিদ। ‘ওদিকে সৈন্য পাঠানো হয়েছে, মিলিটারি পুলিশ গিজগিজ করছে। আরেকটা কথা, কোন অবস্থাতেই রেডিও অন করো না...’

মাথা ঝাঁকাল রানা, অস্ফুটে বলল, ‘ধন্যবাদ।’

সদ্য তন্দুর থেকে বের করা গরম রুটির সঙ্গে তাজা পনির পরিবেশন করা হলো, সঙ্গে ধূমায়িত কফি। লাল ফ্রক আর ব্লাউজ পরা একটা মেয়ে পরিবেশন করল ওদেরকে, নাম বলল বিনাকা। মেয়েটা ভারতীয়, মোবারক তাকে লেবানন থেকে নিলামে কিনে এনেছে। হাসানের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় সে বলল, শুধু চার দেয়ালের ভেতর এই কাপড়ে থাকে সে, বাইরে বেরোয় বোরখা পরে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর লোকজন এলে তাদের মনোরঞ্জন করাই মূল পেশা। মনিবের বিশেষ নির্দেশে আজ তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

চেয়ারে বসে কাঁচ-ঘেরা জানালা দিয়ে বাইরের চৌরাস্তায় তাকিয়ে আছে হাসান। খানিক পরই গ্রামবাসীর চোখ খুলে যাবে, ডানা মেলবে নানা রকম গুজব। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে তার চূলে বিলি কাটছে মেয়েটা। ঠোঁটে অলস হাসি, বসার ভঙ্গিটা শিথিল, যদিও মাথার ভেতর ঝড় বইছে। এই জায়গা নিরাপদ নয় বলেই তার ধারণা। অথচ মাসুদ ভাই ওদের বলছে, আপাতত কোন বিপদের ভয় নেই।

শাফি বসে আছে এক কোণে, হাতে কফির কাপ। নাসের আর লায়লার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাকিয়ে আছে মানে, চোখ একেবারে ফেরাচ্ছেই না। ভাবটা যেন, নাসের আর লায়লাকে বিশ্বাস করতে পারছে না শাফি।

নাসেরকে নিয়ে সন্দেহ রয়েছে হাসানেরও। হিবুত্সাহ গেরিলা আর মুসলিম

ব্রাদারহুড সদস্যদের সে চেনে বটে, কিন্তু সবাইকে নয়। তাছাড়া, লোকটার কাণ্ডজ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব আছে। এরকম একটা অপারেশনে এসে স্ত্রীকে পেয়ে এতটা মত্ত হয়ে পড়া মোটেও গেরিলাসুলভ আচরণ নয়। মেয়েটা, অর্থাৎ, লায়লাও একটা বামেলা। আকাবটাও সমস্যা। তবে হ্যাঁ, কঠিন পাত্রী, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি।

একে একে কাপড় খুলছে লায়লা। ওভার কোট, দুটো চাদর। চাদরের নিচে দুটো সোয়েটার। সব মিলিয়ে যেন দুই পা লাগানো একটা ফুটবল। এত সব মোটা কাপড় পরে সাইকেল চালিয়ে উপত্যকার ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে সে, তাও অন্ধকারের মধ্যে। সবশেষে রশি বেয়ে খাড়া পাহাড় চূড়ায় উঠেছে। তারপরও পনেরো বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়া সহজ কথা নয়।

হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল হাসান। গা থেকে এত সব কাপড় খোলার পরও আকার-আকৃতি প্রায় একই থাকল লায়লার। তারপর ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ধরতে পারল সে। এবং প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো। লায়লা মোটা নয়, সে নয়মাসের পোয়াতি।

কোথাও একটা টেলিফোন বাজছে। কিছুক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। তারপরই কর্কশ চিংকার-চঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ পাথর হয়ে গেল হাসান, কান পেতে কিছু শুনছে। শোরগোলের আওয়াজ থেমে গেছে। শুধু মোরগ ডাকছে। তবে মোরগ থামলে আরেকটা আওয়াজ ভেসে আসছে। খুবই অস্পষ্ট। এঞ্জিনের শব্দ। অনেকগুলো এঞ্জিন। ট্রাকের একটা কনভয় আসছে।

হেঁ দিয়ে পাশ থেকে উজিটা তুলে নিল হাসান। লাল ফ্রক পরা মেয়েটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল গোফরান রুটিঅলা, হঠাৎ গম্ভীর ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠা মুখে বেমানান হাসি। ট্রাকগুলো এরইমধ্যে চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে। পিছনদিকে ক্যানভাস দিয়ে আড়াল করা, মোট চারটে ট্রাক। থামল ওগুলো, পিছন থেকে সৈন্যরা লাফ দিয়ে নিচে নামছে, পরনে ইউনিফর্ম, হাতে উজি, পায়ের বুট কড়মড় করে পাকা রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁকর গুঁড়ো করছে।

ধীর গতিতে চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা স্টাফ কার। দীর্ঘদেহী একজন অফিসার নামল। কিছু একটা বলে গোফরানের ট্রাকের দিকে হাত তুলল। দু'জন সৈনিক এগিয়ে এসে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে ছিন্নভিন্ন করল ট্রাকটার সবগুলো চাকা।

নাহিদের কামরায় ঢুকছে রানা, ঝট করে ঘুরে গোফরানের মুখোমুখি হলো শামিম, বাঘের মত মস্ত দুই থাবা দিয়ে রুটিঅলার দুই কাঁধ খামচে ধরল সে। শূন্যে উঠে পড়ল লোকটার দুই পা। 'সৈন্যরা এল কেন? কে তাদের খবর দিল?'

আতঙ্কে তোতলাচ্ছে গোফরান। 'আমি জানি না...আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল...'

দোরগোড়া থেকে রানা বলল, 'ওরা মেয়েদের টানে আসেনি। তা এলে তোমার ট্রাকের চাকা পাংচার করত না।'

শুধু আতঙ্কিত নয়, গোফরানকে বিব্রতও দেখাল। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। এটা ব্রথেল, এখানে লুকানোর ভাল জায়গা আছে।'

তাকে ছেড়ে দিল শামিম। ঠকঠক করে কাঁপছে গোফরান। 'আমার পিছু নিন, প্রীজ! খোদার কসম বলছি, আমি বেঈমান নই।' কয়েকটা মেয়ের নাম ধরে ডাকল

সে। নির্দেশ পেয়ে কাপ-পিরিচ আর প্লেট, সিগারেটের প্যাকেট, আশট্রে ইত্যাদি দ্রুত সরিয়ে ফেলল তারা। ওয়ার্ড্রোব-এর দরজা খুলল এক মেয়ে। সেটার পিছনে কিছু নেই, ফাঁকা।

গোফরানকে বিশ্বাস করছে রানা। তবে কেউ একজন ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কে সে?

নাহিদকে সাহায্য করতে গেল শামিম, তার হাত ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বাঁশের তৈরি ক্রাচ টেনে নিয়ে নিজেই বিছানা থেকে নামল সে, ব্যথায় গোঙাচ্ছে। ওয়ার্ড্রোবে ঢুকছে ওরা, শব্দ শুনে বোঝা গেল কাফের সদর দরজায় সৈন্যরা বাড়ি মারছে রাইফেলের বাঁট দিয়ে। ওদের পিছনে ওয়ার্ড্রোবের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ধাপ বেয়ে পিছনের ছোট্ট ভেজা উঠানে নেমে এল ওরা, মাথার ওপর ছোট্ট আকাশ। উঠানের পিছন দিকে একটা শেড, দরজার মাথার দিকটা দীর্ঘদিন ধোঁয়া লাগায় কালো হয়ে আছে। রুটি সেকার তীব্র সুগন্ধ ঢুকল নাকে।

পাঁচিলের ওদিক থেকে ভারী ও কর্কশ কমান্ড ভেসে এল, সেই সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কয়েকটা কুকুর। 'জলদি!' তাগাদা দিল গোফরান। সবাইকে ঠেলে শেডের ভেতর ঢোকাল সে।

শেডটা রুটি তৈরির কারখানা। একজোড়া তন্দুর দেখা গেল। বাম দিকেরটা ঢাকা। ডান দিকেরটা খোলা। খোলা ডান পাশের আভেনের দরজার সামনে বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর, পাথরের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মেটাল ট্রে-ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া। একচোখো এক লোককে দেখা গেল, ওদের দিকে ভুলেও তাকাল না, পরনে নোংরা অ্যাপ্রন! 'ট্রেতে শুয়ে পড়ুন,' তাগাদা দিল গোফরান। 'দু'জন করে।'

'বাকি সবাই কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ব্রথলে। ওরা হিব্রু জানে, স্যার। ওদের কাগজ-পত্রে কোন খুঁত নেই।'

লাফ দিয়ে ট্রে-তে বসল হাসান, পাশে উঠল রানা। গোফরান বলল, 'ট্রে থেকে গেলে গড়িয়ে নিচে নামবেন। দুইহাতে চোখ-মুখ ঢেকে রাখবেন।'

হিব্রু ভাষায় ইসরায়েলিদের কথা বলতে শুনছে রানা। এটা ফাঁদ না হওয়াটাই আশ্চর্য, ভাবল ও, আর ফাঁদ হলে এটাই শেষ ফাঁদ। পেটে প্যাক নিয়ে শুয়ে আছে ও। হাত দিয়ে মুখ ঢাকা। বৈঠার মত দেখতে একটা লাঠি ঢোকাল ভেতরে কেউ, সচল হলো ট্রে। আগুনের প্রচণ্ড আঁচ লাগল হাতে। কল্লনার চোখে গম্বুজ আকৃতির তন্দুর দেখতে পেল। চুল ও লোম পোড়ার কটু গন্ধ ঢুকল নাকে। তারপর একটা কথা মনে পড়তে ছ্যাৎ করে উঠল বুক-ওদের সঙ্গে প্রচুর অ্যামিউনিশন রয়েছে!

আগুনের আঁচ থেকে দূরে সরে এল ওরা, বৈঠার ঠেলা খেয়ে ট্রে-টা নেমে এল পাথুরে সারফেসে। জায়গাটা গরম, তবে খুব বেশি নয়। মাথা উঁচু করল রানা। ঘন কালির মত অন্ধকার চারদিক। কপাল থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে ছাদ। তবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল ট্রে-টা, ফিরে এল একটু পরেই, তাতে শুয়ে রয়েছে শামিম আর নাহিদ। নাহিদ হাঁপাচ্ছে, গোঙাচ্ছে। ট্রে থেকে নামাল তাকে রানা। শামিম নিজেই নামল। পাথরে পাথরে ঘষা খেলো। নাও, এবার কাবাব তৈরি

২৩। বন্ধ তন্দুরের ভেতর আটকে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। একটা দরজা, বাইরে থেকে সেটা বন্ধ। আভেন থেকে বিদঘুটে আওয়াজ নেমে আসছে। সন্দেহ নেই, আগুনটাকে উসকে দিয়ে নতুন করে রুটি বানানোর আয়োজন চলছে। মাথা তুলে অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল রানা, দেখতে চায় কোথেকে আসছে বাতাস। সিলিঙে ঠুকে গেল কপালটা। মেঝে থেকে আঠারো ইঞ্চি ওপরে সিলিং, আন্দাজ করল ও। অন্ধকারে দেখার কিছু নেই। করারও নেই কিছু, জ্যাংত পুড়ে মরা ছাড়া। গ্রামা দিয়ে মোড়া বাস্ফটা ছুলো একবার। হাসানের হাত স্পর্শ করল। সেটা ধরে একটু চাপ দিল, সাহস যোগাবার চেষ্টা।

নাকের ছ'ইঞ্চি ওপরে অদৃশ্য সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে হাসান, কান পেতে এনেছে আভেনের ইন্টার পাঁচিল ভেদ করে ভেসে আসা বিচিত্র শব্দগুলো। আগুনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ পেল সে, ধোঁয়ার গন্ধ ঢুকছে নাকে। তন্দুরে আগুন ধরানো হয়েছে। কি আশ্চর্য, আগুনের নিচে ওরা কতক্ষণ টিকতে পারবে! এখানে ওদেরকে থাকতেই বা হবে কতক্ষণ?

তারপর কথ্যবর্তার আওয়াজ শোনা গেল। একটা কণ্ঠস্বর মিনমিনে, বিনয়ে বিগলিত। বাকিগুলো কর্কশ আর ভারী।

অকস্মাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল, একেবারে যেন ওদের কানের পাশে। আভেনের যেদিকটায় আগুন ধরানো হয়েছে, তার উল্টোদিক থেকে চিংকারটা আসছে। ওরা চারজন একটা কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে আছে, সেটার দেয়াল বা ছাদ আঁচড়াচ্ছে কুকুরটা। কোন সন্দেহ নেই, জানোয়ারটা এয়ার হোল দেখতে পেয়ে ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। মানুষের গন্ধ না পেলে এভাবে আঁচড়াত না।

আভেনের পিছনে খুদে সেলটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ওরা ঘামতে শুরু করল।

আভেনগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে গোফরান রুটিঅলাও ঘামছে। আভেন থেকে উড়ে আসা পাতা ও খড়ির ছাই আর ময়দা লেগে রয়েছে অ্যাপ্রনে। ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশের দিকে তাকিয়ে নার্ভাস হাসি হাসছে সে। অফিসার দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রয়েছে, ল্যুগারের ব্যারেল দিয়ে বাড়ি মারছে অপর হাতের কালো দস্তানা পরা গলুতে। সে-ও হাসছে, কিন্তু ধূসর পাথর রঙের চোখ বরফের মতই ঠাণ্ডা। 'সত্যি কথা বলো। কোথায় ওরা?'

'জী?' প্রশ্নটা শুনেও না বোঝার ভান করল গোফরান।

উঠান ভরা সৈন্য। চেইনে বাঁধা একটা কুকুর আরেকজন অফিসারকে টেনে নিয়ে এল। অ্যালসেশিয়ান-এর জিভ বাইরে বেরিয়ে আছে, উত্তেজনা আর প্রত্যাশায় ঠোঁপাচ্ছে ওটা। প্রথম অফিসারকে দ্বিতীয় অফিসার বলল, 'কাফের ওপর ব্রুথলে আমার কুকুর অচেনা কারও গন্ধ পেয়েছে-খালি একটা চেয়ারে বসেছিল কেউ। গন্ধটা ওকে টেনে এনেছে আভেনের কাছে।'

আভেনটা ইতিমধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। কুল কুল করে ধোঁয়া উঠছে ভেতর থেকে, একেবেকে উঠে যাচ্ছে উঠানের মাথায় জমে থাকা কালো

মেঘের দিকে। ইঙ্গিতে আভেনটা দেখাল গোফরান। ‘কাল্পনিক লোকগুলো কি লোহার তৈরি?’ হাসল আবার। ‘সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করুন, যেভাবে আগুন জ্বলছে লোহা গলতেও বেশি সময় লাগবে না।’

প্রথম অফিসারও হাসছে। ‘লোকগুলো যদি কাল্পনিকই হবে, কুকুরটা এত উত্তেজিত কেন?’

‘সেটা তো আমারও প্রশ্ন। একটা রহস্যই বটে।’

অফিসার বলল, ‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাইরের লোক ঢুকছে গ্রামে।’

‘আপনার এরকম বিশ্বাসের পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে?’

কারখানার চারদিকে তাকাল অফিসার। ‘ওই আভেনে কি আছে?’ জানতে চাইল সে।

মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল গোফরান। ‘কি করে বলি। খালি থাকারই তো কথা।’

চিবুকে হাত বুলাল অফিসার। ‘আমার ইচ্ছে হচ্ছে আভেনটা ভেঙে ফেলি।’

‘হে আল্লাহ, রহম করো—অফিসার হেইকির মনে দয়া-ধর্মের বন্যা বইয়ে দাও! অফিসার হেইকি, এই আভেন দুটোই আমার জীবন, আমার রুটি-রুজির অবলম্বন। কি আছে ওগুলোয়?’ একচোখোর দিকে তাকাল। ‘ভাই? জাফরান? কিছু একটা বলো!’

একচোখো জাফরান বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল। ‘মৌরি।’

‘মানে?’ চোখ রাঙাল অফিসার।

‘জাফরান জেরুজালেমের লোক, ওখানকার বেকারিতে রুটি বানাবার সময় ময়দার সঙ্গে মৌরি, কিশমিশ, পেস্তা আর মোরব্বা মেশানো হয়। আর আপনি তো জানেনই, এ-সবই কুকুর খুব পছন্দ করে।’

হাতের ল্যুগারটা জাফরানের দিকে তাক করল অফিসার। ‘আভেনটা খোলো।’

‘ও আল্লাহ, অফিসারের সুমতি দাও!’ কপালে চাঁট মারল গোফরান। এখন আভেন খুললে সব রুটি দরকাঁচা মেরে যাবে!’

‘খোলো বলছি!’ কড়কে উঠল অফিসার।

‘হুজুর, স্যার!’ মিনতি করল গোফরান। ‘সত্যি বলছি রুটি আধ-কাঁচা থেকে যাবে...’

অফিসারের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসছে।

‘আপনি চান আমি গুলি খেয়ে মরি?’ গোফরানকে জিজ্ঞেস করল জাফরান।

‘প্রাণের চেয়ে আপনার কাছে রুটির দাম বেশি হলে?’ অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে আভেনের ঢাকনি সরিয়ে ভেতরে কাঠের লাঠিটা ঢুকিয়ে দিল। লাঠিটা তন্দুর থেকে বের করার পর দে-া গেল শেষ মাথায় একটা কেক রয়েছে, গোল ও বাদামী রঙের। ‘এখনও ভাল করে সেকা হয়নি।’

কেকটা হাতে নিয়ে আঙুল দিয়ে পিষল অফিসার। শূন্যে লাফ দিল কুকুরটা, কেকের নাগাল না পেয়ে অফিসারের হাত চাটছে। বুট দিয়ে কুকুরের পেটে লাথি মারল অফিসার। ব্যথায় ককিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল জানোয়ারটা। কেকের গুঁড়ো নাকের সামনে তুলে গুঁকল অফিসার। মৌরির গন্ধ পেল সে। ‘চমৎকার!’ হাসিটা

ফিরে এল মুখে। ঘুরে উঠানে নেমে যাচ্ছে। ‘কুকুরটা আমাদেরকে ঘোল খাইয়েছে। তবে প্রকৃত সত্য জানার আরও অনেক উপায় আছে।’

অ্যাথ্রনে হাত মুছতে মুছতে তার পিছু নিল গোফরান। ‘জী, হুজুর?’

‘এলাকার মুসলমানরা সব বেঈমান। তলে তলে সবাই মুসলিম ব্রাদারহুড আর হিব্বুল্লাহ গেরিলাদের সাহায্য করো তোমরা। শেফাইমের ওদিকে কাল রাতে সৈন্যদের ওপর চোরা-গুপ্তা হামলা চালানো হয়েছে। সেজন্যে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তিটা হালকা হতে পারে, গ্রামে লুকিয়ে থাকা বহিরাগত শত্রুদেরকে বের করে দিলে। ওদেরকে না পাওয়া পর্যন্ত আমি থামছি না।’ চৌরাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অফিসার। ‘দিয়াম?’

একজন সার্জেন্ট অ্যাটেনশন হলো।

‘চৌরাস্তার প্রতিটা বাড়িতে নক করো,’ নির্দেশ দিল অফিসার। ‘যে দরজা খুলবে, তাকেই নিয়ে এসে এখানে দাঁড় করাও, দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে। সৈন্যদের নির্দেশ দাও, গাছগুলোর নিচে একটা মেশিনগান ফিট করুক।’

গোফরানের চেহারা ময়দার মত সাদা হয়ে গেল। ‘স্যার, হুজুর, এ-সবের মানে কি?’

‘পাঁচ মিনিট পর পর একজন করে লোককে গুলি করে মারা হবে,’ বলল অফিসার। ‘যতক্ষণ না সত্য কথা বলে কেউ। তোমার রুটি পুড়ে যাচ্ছে, গোফরান। তুমি বরং নিজের কাজে ফিরে যাও।’

তিন

অসহ্য তাপে সেক্ষ হচ্ছে ওরা। দেয়াল ভেদ করে নতুন একটা আওয়াজ ভেসে এল। চিনতে অসুবিধে হলো না, মেশিনগানের সিঙ্গেল শট। একটা কথা ভেবে খানিকটা তৃপ্তি বোধ করছে রানা। জেলিগনাইট যদি বিস্ফোরিত হয়, অনেক নিরীহ মানুষ মারা যাবে ঠিকই, তবে তাদের সঙ্গে ইসরায়েলি সৈন্যরাও কেউ বাঁচবে না। যে পরিমাণ জেলিগনাইট ওদের সঙ্গে রয়েছে, ফেটে গেলে গোটা গ্রামের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

‘এখান থেকে বেরুতে পারলে ট্রান্সপোর্ট দরকার হবে আমাদের,’ শামিম আর হাসানকে বলল রানা। ‘কেফার ভিটকিন এখান থেকে পনেরো-বিশ কিলোমিটার দূরে। ঘুরপথে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। সাবমেরিনগুলো রওনা হবে কাল বাদে পরশু, দুপুর একটায়।’

‘ট্রান্সপোর্ট...সাইকেল?’ শামিম জিজ্ঞেস করল।

সবাই চুপ করে আছে, যদিও প্রত্যেকে একই কথা ভাবছে—সঙ্গে একজন অস্ত্রসজ্জা মহিলা ছাড়াও পেটে ও কাঁধে বুলেট নিয়ে আহত একজন বিসিআই এজেন্ট রয়েছে, কাজেই বাহন হিসেবে সাইকেল অচল। হৃদয়হীন যে-কোন লীডার এ-ধরনের বোঝা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু রানার পক্ষে তা

সম্ভব নয়। তাছাড়া, নাহিদ ও লায়লা ওদের মিশন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানে, কোন অবস্থাতেই ওদেরকে শত্রুর হাতে পড়তে দেয়া চলে না।

নিশ্চরতা ভেঙে নাহিদ বলল, 'একটা জীপ আছে।'

'দারুণ! কোথায়, নাহিদ?'

'বেকারির পিছনে, গোলাঘরে। খড়ির নিচে লুকানো। অনেকদিন হলো গোফরান ওটা লুকিয়ে রেখেছে ওখানে।'

তন্দুরের বাইরে থেকে নতুন শব্দ ভেসে এল। কে যেন কথা বলছে এয়ার হোল-এ মুখ ঠেকিয়ে। গলার আওয়াজটা গোফরানের মনে হলো। 'জলদি! বেরিয়ে আসুন!'

'জীপটা ধার চাই আমরা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' জবাব দিল রুটিঅলা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালাতে হবে আপনাদের। কোথায় যেতে হবে জানা আছে, তাই না? আপনার সঙ্গীরা এখনি পৌছে যাবে গোলাঘরের পাশে। তাড়াতাড়ি করুন।'

'দরজাটা খুলুন!'

তন্দুর থেকে আগুন তোলার কাজ চলছে। আভেন থেকে যে দরজাটা ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে সেটা খোলা হলো, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হক্কা ঢুকল ভেতরে। 'দ্রুত আসছে,' জানিয়ে দিল গোফরান।

তন্দুর থেকে দু'জন দু'জন করে বেরিয়ে এল ওরা। বুক ভরে ঠাণ্ডা বাতাস নিল সবাই। 'গোলাঘর! আমার পিছু নিন!' ছুটল গোফরান। শামিমের কাঁধ ধরে পিছু নিল নাহিদ। উঠানে নেমে এসে সবুজ একটা দরজা পেরুল সবাই। খড়ি আর শুকনো পাতায় অর্ধেক ভর্তি হয়ে আছে গোলাঘর। ব্যস্ত হাতে সেগুলো একপাশে সরাতে শুরু করল গোফরান। তাকে সাহায্য করল হাসান আর শামিম। একটু পরই জীপটা দেখা গেল। জীপে বার নেই, সান লাউঞ্জ নেই, কিন্তু সবাইকে উত্তেজিত করে তুলল ছাদে বসানো একজোড়া ব্রাউনিং। শুধু ছাদে নয়, প্যাসেঞ্জার সীটের সামনে হুডের ওপরও রয়েছে আরেকটা। অ্যামিউনিশন বেল্টগুলো পরীক্ষা করল রানা। সব ঠিক আছে।

'আবার আপনারা এক হন,' বলে হাসির ভঙ্গি করল গোফরান।

গোলাঘরে ছড়মুড় করে ঢুকে পড়ল শাফি, নাসের, রিয়াজ। রিয়াজের হ্যাটের অবস্থা করুণ, সম্ভবত ঘুমাবার সময়ও মাথা থেকে খোলেনি। নাসেরের চোখ জোড়া টকটকে লাল হয়ে আছে। সেই প্রথম কথা বলল, 'লায়লা কোথায়?'

কেউ কাঁধ ঝাঁকাল, কেউ হাত নাচাল। শাফি বলল, 'বেচারি খুব ক্লান্ত। ঘুমাচ্ছে। আমরা তাকে রেখে গেলে কোন সমস্যা হবে না। জাল হলেও, তার কাগজ-পত্র নিখুঁত।'

শাফির কথায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে রানা। লায়লা যেখানেই বিশ্রাম নিক, এখন আর তাকে ডেকে আনার সময় নেই। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। গোফরান বলল, 'শাফি ঠিকই বলেছে।' সে থামতেই চৌরাস্তা থেকে আবার মেশিনগানের গুলি হলো। চেহারা দেখে মনে হলো রুটিঅলা কেঁদে ফেলবে। 'প্লীজ, প্লীজ, প্লীজ! তাড়াতাড়ি করুন! চোখের সামনে আপনজনেরা এভাবে একের পর এক খুন হতে

থাকলে কতক্ষণ চুপ করে থাকবে মানুষ? যে-কোন মুহূর্তে মুখ খুলবে কেউ একজন...'

‘মুখ খলবে?’

সৈন্যরা লাইন করিয়ে দাঁড় করিয়ে মানুষ মারছে। প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করে। গোফরান রুটিঅলার মুখ ঝুলে পড়ল, চোখ দুটো ভেজা ভেজা। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

নাসের বলল, ‘তোমাকে আমি শক্ত মানুষ হিসেবে চিনি, গোফরান। তুমি যদি...’

শূন্য দৃষ্টিতে নাসেরের দিকে তাকাল গোফরান। ঠেকাতে পারল না, ঝরঝরিয়ায় কেঁদে ফেলল। ‘নাসের ভাই, প্রথমেই ওরা আমার মাকে গুলি করেছে।’

প্রথমে রক্তলাল, তারপর ছাই হয়ে গেল নাসেরের চেহারা।

‘আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন,’ বিড়বিড় করল শামিম।

‘উনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যে,’ বলল রানা। ‘এমন একজন মা আমাদের সবার গর্ব। ভাই গোফরান, দোয়া কোরো আমরাও যেন তোমার মত সাহসী হতে পারি।’

রানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল গোফরান। ‘আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, আপনাদের মিশন যেন সফল হয়। প্যালেস্টাইন জিন্দাবাদ! ইহুদিবাদ নিপাত যাক!’ রানার সঙ্গে কোলাকুলি করল সে। তার কাঁধে ভারী একটা হাত রাখল শামিম।

নাসের বলল, ‘লায়লাকে আমি, ভাই, তোমার হাতে শপে দিয়ে গেলাম।’

‘আমি সম্মানিত বোধ করছি,’ বলল গোফরান। ‘এবার আপনারা যান। আপনারা চলে গেলে ওদেরকে আমি থামাতে পারব।’

‘কিভাবে?’

‘মেয়েগুলোকে দিয়ে বলাব, তারা আপনাদের দেখেছে,’ বলল গোফরান। ‘ইসরায়েলি অফিসাররা ওদেরকে খুব পছন্দ করে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ব্রথেলের ওরাই তো একমাত্র খন্দের। কোন মুসলমানকে এখানে আমি ঢুকতে দিই না।’

রানা জানতে চাইল, ‘আমরা গ্রাম ছেড়ে বেরুব কিভাবে?’

‘জীপ চালিয়ে সোজা চলে যাবেন,’ বলল গোফরান। ‘খড়ির ডান দিকে গেট আছে।’

দু’হাতে কপালটা টিপে ধরল নাসের। ‘লায়লার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেয়া দরকার। আমার বাচ্চা...’

‘নাসের ভাই, আপনার পায়ে পড়ি—যান!’ মিনতি করল গোফরান।

নাসের নড়ছে না দেখে তার একটা কাঁধ আঁকড়ে ধরে টান দিল শামিম, শূন্য তুলে বসিয়ে দিল জীপে। ‘আর একটাও কথা নয়। হাসান, গাড়ি ছাড়ো।’

‘চৌরাস্তায় বেরুব?’

ঠাণ্ডা চোখে হাসানের দিকে তাকাল রানা। ‘তুমি সময় নষ্ট করছ। বেরুব আর কোন পথ আছে?’

প্রথমবারই স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ইতিমধ্যে নাহিদকে জীপে তোলা হয়েছে। বাকি

সবাইও ঠাসাঠাসি করে জায়গা করে নিল। গ্রামের শান্ত, থমথমে পরিবেশে এঞ্জিনের আওয়াজ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এলাকায় সৈন্যদের ছাড়া আর কারও গাড়ি থাকার কথা নয়।

ফোর-হুইল ড্রাইভে গাড়ি ছোটাল হাসান। থ্রুটলে চাপ দিতেই গর্জে উঠল এঞ্জিন। ক্লাচ ছেড়ে দেয়া হলো। শুকনো খড়ি আর পাতার ওপর দিয়ে ছুটল জীপ। দিনের আলোয় বেরিয়ে এল ওরা। সুরু একটা গলিতে পড়ল, দু'চাকায় গাড়ি চালিয়ে বাঁক ঘুরল হাসান, প্রথমবার বাম দিকে, দ্বিতীয়বার ডান দিকে। গলির শেষ মাথায় এক চিলতে চৌরাস্তা দেখা গেল, কয়েকটা গাছের ছায়া সহ। ছায়ায় ইসরায়েলি সৈন্যরা শুয়ে আছে, সামনে তেপায়ার ওপর মেশিনগান। 'সিভিলিয়ানরা মাথা নামাও,' নির্দেশ দিল রানা। চট করে মাথা নামাল শাফি, নাসের ও রিয়াজ। বনেটে ফিট করা ব্রাউনিং কক করে সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, 'ওপেন ফায়ার।'

চৌরাস্তার এক বাড়ির পাঁচিলে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন নারী-পুরুষ, বেশিরভাগই মধ্যবয়সী, কেউ কেউ বৃদ্ধ। তাদের ডান পাশে পড়ে আছে দুটো লাশ, মারা গেছে উজির গুলিতে। পাঁচজন সৈন্য বিশ হাত পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়েছে, তাদের পাশে শুয়ে আছে একজন, সামনে তেপায়ার ওপর একটা উজি মেশিনগান। সুরু গুলি থেকে বেরিয়ে আসা আওয়াজটা প্রথমে তারা কেউ চিনতে পারল না, মনে হলো বিশালাকার কোন টাইপরাইটারের শব্দ বুঝি। উজিটা ধাক্কা খেয়ে শূন্যে উঠল, ডিগবাজি খেতে খেতে ছিটকে পড়ল দূরে। দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচজন সৈন্য ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেল, সারা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শুয়ে থাকা লোকটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ব্রাউনিঙের এক পশলা বুলেট তার মাথা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট রাখল না। খানিক ডান দিকে স্টাফ কারটা দাঁড়িয়ে ছিল, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো সেটার পেট্রল ট্যাংক।

গুলির মুখ থেকে জীপ নিয়ে চৌরাস্তায় বেরিয়ে এল হাসান। ডান দিকে বাঁক নিতে যাবে, বাম দিক থেকে কড়কে উঠল একটা রাইফেল। জীপের ছাদে লেগে আকাশের দিকে উঠে গেল বুলেটটা। বাঁক ঘোরার পর সামনের রাস্তায় ইসরায়েলি সৈন্যদের ছোট একটা গ্রুপকে দেখা গেল। আবার গর্জে উঠল ব্রাউনিং। পাল্টা গুলি হলো রাইফেল থেকে, জীপের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে দেখা গেল রাস্তায় শুয়ে পড়েছে সৈন্যরা, গড়াগড়ি খাচ্ছে। জ্যান্ত, রক্তাক্ত মানুষের ওপর উঠে পড়ল চাকা, ঘন ঘন ঝাঁকি খেয়ে ছুটল জীপ।

চৌরাস্তার বিপদ পিছনে ফেলে এল ওরা। 'কেফার ভিটকিন কোন দিকে?' জানতে চাইল রানা।

'এটাই রাস্তা,' বলল শাফি। 'সামনে অবশ্য একটা ট্র্যাক পড়বে।'

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক চিলতে করে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাসে লোন গন্ধ, তার সঙ্গে মিশে আছে শুকনো সামুদ্রিক মাছের ঝাঁঝ-সাগরের কাছাকাছি রয়েছে ওরা। পাকা রাস্তা, সমতল, বাঁকগুলো তীক্ষ্ণ নয়। শাফি জানাল, উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার এটাই একমাত্র পথ। সাবধান করে দিল সে, সামনে সৈন্য আছে। এরইমধ্যে নিশ্চয়ই রেডিওতে ব্রাউনিং বসানো জীপের খবর পেয়ে গেছে

তারা ।

রানা ভাবছে, ওরা যে নেতানায়ার একটা গ্রামে ছিল, এ-খবর ইসরায়েলি সৈন্যরা পেল কিভাবে? 'গ্রামে তোমরা কোথায় লুকিয়েছিলে?' শাফিকে প্রশ্ন করল ও ।

'গোফরান আমাদেরকে এক জায়গায় রাখেনি । আমি ছিলাম একটা মেয়ের সঙ্গে, বন্ধ দরজার ভেতর ।'

'কিন্তু ওরা তো মেয়েদের ঘরগুলোও সার্চ করে, তাই না?'

'আমার কাগজ-পত্রে কোন খুঁত নেই,' বলল শাফি । সামান্য গম্ভীর, খানিকটা অভিমানী । 'কাজেই আমার ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা । উত্তর না জানা অনেক প্রশ্ন কানের পাশে মাছির মত ভেঁ-ভেঁ করছে ।

'বাঁ দিকে,' হাসানকে বলল শাফি ।

মেইন রোড ছেড়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষা ট্র্যাক-এ পড়ল জীপ, খানিক পর দু'পাশে জঙ্গল দেখা গেল । এক পর্যায়ে পরিত্যক্ত খেতের মাঝখান দিয়ে ছুটল জীপ, উঠে এল কাঁকর ছড়ানো প্রাচীন একটা পথে । 'ঘুরপথে যাচ্ছি আমরা, কেফার ভিটকিনের পিছন দিকে পৌঁছুব । একটা পাহাড় টপকে উপত্যকায় নামতে হবে, তারপর আরেকটা পাহাড় পড়বে, সেটার ওদিকে কেফার ভিটকিন । সৈন্যরা সাধারণত এদিকে আসে না ।'

জীপের সামনে তিনজন বসেছে, পিছনে চারজন । নাহিদ চোখ বুজে আছে, ঘুমাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না । জীপ বোল্ডারে ধাক্কা খেলে ব্যথায় কঁচকে উঠছে মুখের পেশী । কোঁ-কোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে এক ঘণ্টা ধরে পাহাড়ে উঠছে জীপ । নিজেদের মধ্যে হিক্র ভাষায় ফিসফাস করছে শাফি আর নাসের ।

অকস্মাৎ চেষ্টায়ে উঠল নাসের । রাগে বেগুনি হয়ে গেছে চেহারা । শাফির গলাটা দু'হাতে চেপে ধরল, একটা ভাঁজ করা হাঁটু তুলে দিল বুকের ওপর । তারপর গলা ছেড়ে মাথাটা ধরল, জীপের গায়ে ঠুকছে । শামিম তার মস্ত থাবা দিয়ে চেপে ধরল নাসেরকে । গড়িয়ে পিছিয়ে গেল শাফি, খক্-খক্ কাশছে । শামিমের থাবার ভেতর মোচড় খাচ্ছে নাসের, এখনও চেঁচাচ্ছে ।

গর্জে ওঠা রাইফেলের মত আওয়াজ করল রানা, 'শাট আপ!'

নাসের চুপ করল ।

'কি ঘটনা?'

নাসেরের চোখ দুটো পিরিচ হয়ে উঠেছে । 'লায়লা!'

'কি হয়েছে লায়লার?'

'আমাকে বলা হয়েছে গ্রামের একটা বাড়িতে ঘুমাচ্ছে সে । অথচ শাফি এখন বলছে, একজন মিলিটারি পুলিশ অফিসার লায়লাকে নিয়ে গেছে, একটা লেদার ওভারকোট পরিয়ে ।' দু'হাতে মুখ ঢাকল নাসের ।

রানার তলপেট খালি খালি লাগল । 'কথাটা কি সত্যি, শাফি?'

শাফি ঠোট কামড়াল । 'হ্যাঁ ।'

'কিভাবে জানলে তুমি?'

'আমি একটা মেয়ের ঘরে ছিলাম, জানালা দিয়ে দেখলাম অফিসার তাকে ট্রাকে

তুলছে।’

‘আগে কেন জানাওনি আমাকে?’

‘এরইমধ্যে ক’জন মারা গেছে, গুনে দেখেছেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল শাফি। ‘প্রথম মিশনের সবাই খুন হয়ে গেছে, একমাত্র মেজর নাহিদ বাদে। ফায়েদ খুন হয়েছে, খুন হয়েছে গোফরান রুটিঅলার মা। মিশনের স্বার্থেই ঘটনাটা চেপে রাখি আমি। আমাদের কাজ সাবমেরিন ধ্বংস করা, ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়।’

‘তুমি একটা পিশাচ,’ চোঁচিয়ে উঠল নাসের।

‘শাট আপ!’ আবার ধমক দিল রানা। শাফির কথায় যুক্তি আছে। তারপর লায়লার কথা ভাবল ও। ‘মেয়েটা মুখ খুলবে।’

‘অসম্ভব!’ প্রতিবাদ করল নাসের।

‘অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে, কথা বলানো পানির মত সহজ,’ বলল শাফি। ‘তবে লায়লাকে আমি চিনি। যত টরচারই করা হোক, দুটো দিন চুপ করে থাকবে সে। এটাই নিয়ম। আমাদেরকে কাজ সারার সময় পাইয়ে দেবে।’

স্ট্র হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে আনল রিয়াজ। ‘কিন্তু ইসরায়েলি সৈন্যরা কি অত বোকা? লায়লা দু’দিন চুপ করে থাকলে কারণটা তারা আন্দাজ করতে পারবে না?’

‘ও আল্লাহ!’ প্রায় কঁদে ফেলার অবস্থা হলো নাসেরের।

‘তবে শান্ত হও,’ বলল রিয়াজ। ‘মিলিটারি পুলিশ আজেবাজে প্রশ্ন করলে উত্তরও পাবে আজেবাজে। কি জিজ্ঞেস করতে হবে তা তারা জানবে কিভাবে?’

‘আমাদের কাছে একজোড়া ব্রাউনিং আছে,’ বলল নাসের, ‘চলুন, এম.পি. হেডকোয়ার্টার বারডেক-এ যাই, ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনি লায়লাকে।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘দুঃখিত। তা সম্ভব নয়।’

রানার দিকে কাতর চোখে তাকাল নাসের। ‘আমার সন্তানের কথা একবার ভাববেন না?’

‘সত্যি আমি দুঃখিত,’ বলল রানা। ‘মিশনের স্বার্থে পিছানোর কোন উপায় নেই আমাদের।’

আর কোন কথা হলো না।

ঢাল বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল জীপ। অপরপ্রান্তের ঢাল বেয়ে নামার সময় নিচে কুয়াশা ঢাকা উপত্যকা দেখা গেল অস্পষ্ট ভাবে। গোফরান কফি ভর্তি ফ্লাস্ক দিয়েছে, সেটা খুলল নাসের। তার চোখ দুটো চক চক করছে। গাছপালায় ঢাকা পাহাড়ের একটা কাঁধ রাস্তা আর উপত্যকার মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ভেতর থেকে উঁকি দিল সূর্য। আহত নাহিদের চারপাশে ভন-ভন করছে এক ঝাঁক মাছি। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ট্র্যাক, দুই চুড়ার মাঝখানে দিয়ে চলে গেছে। দূর নীলিমায় একজোড়া শকুন ঝুলে আছে। আশপাশে কোথাও সৈন্য নেই। ঢাল বেয়ে নামছে জীপ, পাহাড়ের কোণে নীল সাগরের অংশবিশেষ দেখতে পেল হাসান।

ট্র্যাক আবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে। নীল সাগর হারিয়ে গেল

ফুয়েল ট্যাংকে এখনও যথেষ্ট তেল আছে। তবে অনেক দূর যেতে হবে ওদেরকে। শাফি বলল, 'আর এক কিলোমিটার দূরে বড় রাস্তা পড়বে। সৈন্য, এবং রোডব্লক থাকতে পারে।'

'পাঁচশো গজ এগিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে দাও, হাসানকে নির্দেশ দিল রানা। 'রাস্তায় উঠব কোন শব্দ না করে।'

এঞ্জিন বন্ধ করার পর শুধু স্প্রিংয়ের কাঁচাকাঁচ আর নাসেরের নাক টানার আওয়াজ শোনা গেল। গাছগুলোয় প্রচুর পাখি, কিচিরমিচির করছে। এ-সব আওয়াজকে ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ ভেসে এল-হাসাহাসি করছে কারা যেন। শামিমের কাঁধে টোকা মারল রানা। উত্তরে মাথা ঝাঁকাল শামিম।

জীপ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, ট্র্যাক ধরে ছুটল। তার বিশাল কাঁধ মিলিটারি পুলিশ অফিসারের সবুজ ইউনিফর্মে ঢাকা, জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিলল নাসের, মনে পড়ে গেল কি প্রচণ্ড শক্তিতে শাফির গা থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনে শামিম। চোখ ফিরিয়ে এনে শাফির দিকে তাকাল সে। লায়লা যদি ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশের হাতে মারা যায়, সেজন্যে দায়ী থাকবে এই শাফি।

চোখ ফিরিয়ে নিল নাসের। শাফির দিকে তাকাতে ঘৃণা হচ্ছে তার।

জীপটাকে পিছনে ফেলে দ্রুত নেমে গেল শামিম। শুকনো পাতা আর ভাঙা ডাল এড়িয়ে পা ফেলল, জঙ্গলের কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে রাস্তায় তাকাতেই দেখতে পেল বালির বস্তা দিয়ে তৈরি এনক্লোজার, ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের মাজল, তার কাছ থেকে বিশ গজ বাঁ দিকে। এনক্লোজারের পাশে লাল-সাদা রঙ করা একটা বার আড়াআড়িভাবে ফেলে রোডব্লক তৈরি করা হয়েছে। ট্র্যাক থেকে গড়িয়ে রাস্তায় পড়লে জীপটা ওই রোডব্লকের পিছনে পড়বে।

পিছিয়ে এল শামিম। উপত্যকার কিনারা ধরে দ্রুত হেঁটে চেক পয়েন্টটাকে পাশ কাটাল। অনেকটা ওপরে উঠে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল মেশিন গানের কাছে কেউ নেই। রাস্তার ধারে, ঘাসের ওপর, শুয়ে রয়েছে পাঁচজন ইসরায়েলি সৈনিক, সবাই সিগারেট ফুঁকছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, মাঝে মধ্যে গলা ছেড়ে হেসেও উঠছে।

রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখা ধরে আরও পঞ্চাশ গজ এগোল শামিম, তারপর কাঁধ থেকে উজ্জি নামিয়ে তলপেটের কাছে বাগিয়ে ধরল, হেলমেটটা নামিয়ে আনল চোখের ওপর, জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা ধরে হাঁটছে। সোজা সৈনিকদের দিকে।

বুটের আওয়াজ পেয়ে লোকগুলো তাকাল। এরকম প্রকাণ্ডদেহী এম.পি. অফিসার আগে কখনও দেখিনি তারা। একটা কৌতুক বলছিল সার্জেন্ট, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো। 'স্যার?' হতভম্ব হয়ে জানতে চাইল সে, 'গাড়ির আওয়াজ পেলাম না, আপনি কোথেকে...'

বাকি চারজন বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এখনও শুয়ে আছে ঘাসের ওপর।

পাহাড়ী ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা জীপ থেকে কিছুই ওরা শুনতে পায়নি। একটা কোকিল ডাকছে। ঘন ঘন ডানা ঝাপটে একটা পায়রা উড়ে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। এমন এক নিস্তব্ধতা, অপারেশন থিয়েটারের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে। পাঁচ মিনিট পর কোকিলের ডাককে ম্লান করে দিল একটা পেঁচার ডাক। ‘গাড়ি ছাড়ো,’ বলল ও।

হাসান এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। রানার মত সে-ও জানে এঞ্জিনের আওয়াজ শোনার জন্যে শত্রুরা কেউ বেঁচে নেই।

রাস্তার কিনারায় অপেক্ষা করছিল শামিম, দীর্ঘ ও বাঁকা একটা ছোরার ফলা ঘষছে ঘাসে। রাস্তার উঁচু ঘাস-ঢাকা পাড়ে খয়েরি ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন লোক একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ফুলের ওপর শুয়ে আছে সবাই, হলুদ আর সাদা ফুলগুলো বেশিরভাগই লাল হয়ে গেছে। লাফ দিয়ে জীপে চড়ল শামিম। স্পীড বাড়িয়ে দিল হাসান।

অকস্মাৎ আঁতকে ওঠার শব্দ। শাফির দৃষ্টি অনুসরণ করে ফেলে আসা রাস্তার দিকে তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল নাসের, ট্রাউজারের চেইন লাগাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে। জীপের আওয়াজ শুনেছে সে, ধরে নিয়েছিল নিজেদের বাহন হবে। জীপের রঙ বাদামী দেখে ভুলটা ভাঙল। কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে লক্ষ্যস্থির করছে।

এক পশলা বুলেট ছুটে এল। টং করে আওয়াজ হলো, জীপের কোথাও লেগেছে। পরমুহূর্তে নাসেরের হাতে গর্জে উঠল উজি। ঝাঁকি খেলো লোকটা, রাস্তায় পড়েও থামল না, গড়াতে গড়াতে এনক্লোজারের ভেতর সৈঁধিয়ে গেল।

‘থামো।’ নির্দেশ দিল রানা।

জীপ থামাতেই নিচে নামল শামিম, হাতে শটগান, গুলি করতে করতে এনক্লোজারের দিকে ছুটছে। এনক্লোজারের ভেতর ফিল্ড টেলিফোন রয়েছে, রিসিভার তুলে কথা বলছে লোকটা। শটগানের গুলি লেগে তার মাথার হেলমেট উড়ে গেল, পরের বুলেটটা ফুটো করে দিল কপাল।

জীপের কাছে ফিরে এল শামিম। ‘আর কোন সমস্যা নেই।’

‘আছে,’ বলল রানা। ‘পেট্রল ট্যাংকে বুলেট লেগেছে। লোকটা কি হেডকোয়ার্টারে ফোন করতে পেরেছে?’

‘বলা মুশকিল। সব তেল বেরিয়ে গেছে?’

‘সব।’

রানা, নাসের আর শাফি জীপের পিছনে চলে এল। শামিমও কাঁধ দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। চাকাগুলো গড়াতে শুরু করল। হাসান হুইল ধরে আছে। স্পীড বাড়ল জীপের, কয়েকটা বোল্ডার টপকে ধাতব আওয়াজ তুলে পড়ে গেল গভীর নালায়।

রেডিওর সামনে উবু হয়ে বসেছে রিয়াজ, টিউনিং ডায়ালে চোখ। রানা নির্দেশ দিল, ‘এখন থেকে রেডিও সাইলেন্স বজায় রাখতে হবে, প্লীজ।’

মাথা ঝাঁকাল রিয়াজ। প্যাকটা কাঁধে ফেলল সে। ‘কত দূর?’

‘সাগর এখান থেকে বিশ কিলোমিটার,’ জবাব দিল শাফি। ‘মাঝখানে একটা

রিজ পড়বে। বেশ উচু।

হাই তুলে তামা দিয়ে জড়ানো বাস্তু দুটো কাঁধে তুলল হাসান। ‘অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়েছি, হাঁটতে ভালই লাগবে।’

‘নাহিদকে সাহায্য করছি আমি,’ বলল শামিম।

নিজের পায়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাহিদ। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে। চোখের নিচে কালি। ক্রাচটা তুলে শামিমের বুকে ঠেকাল সে। ‘আমি একাই পারব।’

নাসের একটা ব্যাগ তুলল কাঁধে। ওটায় ইউনিফর্ম আছে।

‘শাফি সামনে থাকো,’ বলল রানা। ‘মার্চ।’

গুরু হলো পদযাত্রা। উপত্যকার মেঝে থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে খাড়া উঠে গেছে ট্রাক। অনেক কাল আগে গাধার পিঠে তুলে মাল বহন করা হত, পাথর কেটে ধাপ তৈরি করা হয়েছে, ধাপের কিনারায় ছয় ইঞ্চি উঁচু পাঁচিল, ছাগল বা গাধা যাতে নিচে না পড়ে যায়। ঝোপ-ঝাড় খুব সামান্যই। এক পর্যায়ে একটা গভীর খাদে নামল ওরা। পাথরে শব্দ করছে নাহিদের ক্রাচ, ব্যান্ডেজ বাঁধা ক্ষতগুলোকে ঘিরে ভন্ ভন্ করছে মাছি।

বেলা এগারোটার দিকে মেঘে ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। খাদ থেকে ঢাল বেয়ে পাহাড়ের একটা কাঁধে চড়ল ওরা। সরু পথ ধরে চড়ায় পৌঁছল। পঁচাত্তরো পথ, আবার নামছে। কাঁধে রেডিও প্যাকের বোঝা, হাঁপিয়ে গেছে রিয়াজ। শাফির ছন্দপতন ঘটছে না, মাপা পা ফেলে দ্রুত হেঁটে চলেছে। সবাই মাঝে মধ্যে কথা বলছে, একা শুধু নাসের বাদে।

দুপুরে বৃষ্টি নামল। আকাশের দ্রুতগতি মেঘ ভয় পাইয়ে দিল ওদেরকে। শাফি বলল, ‘আর মাত্র একটা পাহাড় উপকাতে হবে।’

‘কত দূর?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এক ঘন্টা লাগবে,’ বলল শাফি। ‘তবে ঝড় গুরু হলে আশ্রয় দরকার হবে। আমি একটা গুহা চিনি।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘আমরা কোথাও থামব না। বিশেষ করে কোন গুহায়।’

‘এটা নিরাপদ গুহা,’ বলল শাফি। ‘ঝড় উঠলে পাথর ধস শুরু হতে পারে।’

‘গুহাটা কতদূরে?’

‘বিশ মিনিটের মধ্যে পেয়ে যাব।’

ক্রাচটা ছিটকে গেল একদিকে, সেই সঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ল নাহিদ। পড়ার পর আর নড়ছে না। তার পাশে হাঁটু গাড়ল শামিম। এমনিতে তার চেহারায় কোন ভাব ফোটে না, এই মুহূর্তে উদ্ভিগ্ন দেখাল। ‘কপাল পুড়ে যাচ্ছে-জ্বর।’

‘ওকে তুমি বইতে পারবে?’

জবাবে নাহিদকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরল শামিম। বৃষ্টি থেমে গেল। একটা খাদ থেকে লাইমস্টোনের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাক নিয়ে উঠেছে ঢালটা। শামিমের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ পাচ্ছে রানা। ঢালের মাথায় উঠে এল ওরা। সামনে পাহাড়-প্রাচীর প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। প্রাচীরের সামনে ছোট একটা মালভূমি, সরু হতে হতে খুদে নালায় পরিণত হয়েছে।

নালাটা প্রাচীরের গোড়া পর্যন্ত বিস্তৃত, শেষ মাথায় প্রচুর বোল্ডার স্তূপ হয়ে আছে।
'এখানে,' বলল শাফি।

ঢালের মাথায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, কান পেতে। 'লুকাও! গুহার ভেতর, জলদি!'

পরমুহূর্তে আওয়াজটা সবাই শুনতে পেল। প্লেন এঞ্জিনের যান্ত্রিক গুঞ্জন। ছুটল সবাই। কিন্তু আওয়াজটা একেবারে মাথার ওপর চলে এল। গুহার ভেতর ঢোকান সময় পাওয়া যাবে না, কাজেই আবার চিৎকার করল রানা, 'শুয়ে পড়ো!' চারপাশে বোল্ডার, লাইমস্টোনের মেঝেতে শুয়ে পড়ল সবাই। ধীর, অলস ভঙ্গিতে মাথার ওপর চলে এল ইসরায়েলি এয়ারফোর্স-এর একটা অবজারভেশন প্লেন। দুটো বোল্ডারের মাঝখানে চিৎ হয়ে রয়েছে রানা। প্লেনটা খুদে মালভূমিকে ঘিরে চক্র দিচ্ছে। প্লেনটা ছোট, পিছনের সীটে বসে আছে অবজারভার, চোখে সাঁটা বিনকিউলার। লোকটাকে পরিষ্কারই দেখতে পেল ও।

পাহাড়-প্রাচীরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেন। শান্তি মিশনের সদস্যরা সিঁধে হলো, ক্লান্ত শরীর টেনে নিয়ে এল গুহার ভেতর। প্রবেশপথটা সরু একটা ফাটল ছাড়া কিছু নয়। তবে ভেতরে মাঝারি একটা কামরার মত জায়গা পাওয়া গেল। মেঝের পাথরে অসংখ্য ফাটল, ছাগলের বিষ্ঠায় ভরা। সিলিংটা এত উঁচু, অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখার নেই। দেয়ালগুলো মসৃণ, ভেজা ভেজা। ছাদ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে।

ঐ হ্যাটে হাত রেখে রিয়াজ জানতে চাইল, 'প্লেন থেকে ওরা কি আমাদেরকে দেখে ফেলেছে?'

কাঁধ থেকে প্যাক নামাল রানা। 'বোঝা গেল না, বিশ মিনিট। তার বেশি এখানে থাকা উচিত হবে না।'

'আমাদেরকে দেখে থাকলে যে-পথে এসেছিল সে-পথেই ফিরে যেত পাইলট, তাই না?' রিয়াজকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'রিপোর্ট করার জন্যে?'

রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, রানা মাথা ঝাঁকাতে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল শামিম। 'হাসান, নাহিদকে দেখো। শাফি, কিছু খাওয়াও।'

নাহিদের চোখ খোলা। হাসান তার পাশে বসছে দেখে বলল, 'ব্যথা!'

তাকে একটা মরফিন ইন্জেকশন দিল হাসান। 'এখনি আরাম পাবে, দোস্ত।'

চোখ বুজল নাহিদ, ঘুমিয়ে পড়েছে। পেটের ব্যাভেজটা খুলল হাসান। খোলার পর এক চুল নড়ল না। তারপর ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল।

পেটের ডান দিকে গভীর একটা গর্ত। ক্ষতের চারপাশ হলুদ হয়ে গেছে, ভেতরটা দগদগে ঘায়ের মত, লাল। পচা মাংসের গন্ধ ঢুকল নাকে। বুলেটটা ডান দিকে ঢুকে বাঁ দিকে সরে গেছে। অ্যাবডোমিনাল পেশীগুলো ভেদ করে কতটা ভেতরে ঢুকেছে বলা কঠিন। হাসানের কাছে এমন কোন ডাক্তারী সরঞ্জাম নেই যে ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করতে পারবে। ফাস্ট-এইড বক্স হাতড়ে সালফা পাউডার ভর্তি একটা ক্যান বের করল সে। গর্তটা পাউডারে ভরে নতুন করে ব্যাভেজ বেঁধে দিল। কাঁধের ক্ষতটা তেমন বিপজ্জনক নয়।

'কি রকম বুঝছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সিগারেটে কষে টান দিল হাসান। ‘জানি না...নাহিদ হয়তো ভাগ্যবান।’

‘পনির আর রুটি,’ বলল শাফি। ‘কাপ ভর্তি করে কফি দিতে পারছি না-এক কাপ দু’জন ভাগ করে খেতে হবে।’

রানা নাহিদের কথা ভাবছে। ওকে ফেলে গেলে বাঁচবে না। তাছাড়া, প্লেনের অবজারভার ওদেরকে দেখে থাকলে এক সময় সৈন্যরা এখানে পৌঁছুবেই। নাহিদকে কথা বলাবে তারা। চোখ বুজে আসছে, তাড়াতাড়ি সিধে হলো ও, আধ কাপ কফি খেয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। তারপর এগোল গুহার মুখের দিকে।

নালা যেন একটা করিডর, করিডরের ছাদ আকাশ। বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। শামিমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রানার পাশে এসে দাঁড়াল শাফি। ‘আর ছোট্ট একটা পাহাড় উপকালেই সাগর।’

‘দূরত্ব?’

‘বিশ কিলোমিটার।’

‘পাহাড়ের ওপাশে ঝড় নেই,’ বলল শাফি। হাসছে সে। ‘আরেকটা পথ আছে, গুহার ভেতর দিয়ে।’

‘মানে?’

রানার হাত ধরে গুহার ভেতর টেনে নিয়ে এল শাফি, পিছনের দেয়ালে ছায়া ঢাকা একটা ফাঁক দেখাল। ‘এক সময় এই জায়গায় পাহাড়-প্রাচীর থেকে একটা নদী বেরিয়ে আসত। নদীটা এখনও আছে, তবে নতুন একটা সহজ পথ পেয়ে গেছে। এখন সেটা উপত্যকায় নেমেছে হামাক রোডের কাছাকাছি। এক লোক একবার আমাকে বলেছিল, সে নাকি পাহাড়ের তলা দিয়ে হেঁটে অপরপ্রান্তে বেরুতে পেরেছিল। ভেতরে শ্যাফট, জলপ্রপাত ইত্যাদি সবই আছে।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়।’ হাতঘড়ি দেখল। পনেরো মিনিট হলো এখানে রয়েছে ওরা। ‘আর তিন মিনিট পর রওনা হব আমরা। নালা ধরে যাব।’

গুহায় ঢুকল শামিম, সামান্য হাঁপাচ্ছে। ‘ইসরায়েলি পেট্রল!’

স্থির হয়ে গেল রানা। ‘ক’জন?’

‘সম্ভবত ত্রিশ।’

গুহার মুখে এসে দাঁড়াল রানা। মালভূমির কিনারায় অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মূর্তিগুলো। শুধু মানুষ নয়, সঙ্গে চারপেয়ে জন্তুও আছে। শামিম বলল, ‘তুমি নির্দেশ দিলে পাহাড়ে উঠে যাই আমি, ওদেরকে এদিক থেকে সরিয়ে দিই।’

‘না,’ বলল রানা। ‘সৈন্যদের সরিয়ে দেয়া সম্ভব, কিন্তু কুকুরগুলোকে ফাঁকি দেয়া যাবে না।’ ‘গুহার ভেতর ঢোকো সবাই।’

‘মাসুদ ভাই, আমরা ফাঁদে আটকে পড়ব!’ প্রতিবাদ করল শামিম।

‘পিছনের দেয়ালে একটা ফাঁক আছে। ভেতরে নদী পাব।’

মালভূমি থেকে একটা কমান্ড ভেসে এল, সৈন্যদের লাইনটা স্থির হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের উজ্জিটা তুলল শামিম। গুলি হলো এক পশলা, তবে লাইন থেকে মাত্র একটা লোক ছিটকে পড়ল। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে নালায় নেমে

গেল রানা, স্থির হয়ে গুলি করল, দেখাদেখি গড়িয়ে ওর পাশে চলে এসেছে শামিমও। ওদের মাথার ওপর পাথরে লাগছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, পাল্টা গুলি করছে ইসরায়েলি সৈন্যরা। ‘আমি কাভার দিই, তুমি গুহায় ঢোকো,’ বলল শামিম।

গুহার মুখে ঢুকেছে রানা, নালার দূর প্রান্তে চারজন সৈনিককে দেখা গেল। বেলেট কি যেন হাতড়াচ্ছে শামিম। হাতটা উঁচু করল সে, ঝাঁকি খেলো। কালো ডিম-গ্রেনেড। নালার মুখে পড়েছে কি পড়েনি, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। আত্ননাদ শোনা গেল। তবে গুলি বর্ষণ বেড়ে দ্বিগুণ হলো, গুহার মুখ ভেঙে চওড়া করে ফেলছে।

গুহার ভেতর পিছিয়ে আসছে রানা, ভাবছে—ওরা আমাদের খোঁজ পেল কিভাবে? কুকুর? নাকি কোন ধরনের সংকেত পেয়ে এসেছে? এখন অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। ইসরায়েলিরা রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে রেডিও মেসেজ পাঠাবে। কিংবা রিইনফোর্সমেন্ট হয়তো এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। এখন যদি মর্টারের একটা গোলা পড়ে গুহার মুখে, একজনও বাঁচবে না ওরা।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঢুকছে গুহার ভেতর। ছাদ ধসে পড়ছে, খসে পড়ছে দেয়ালের ছাল। ‘হাসান,’ ডাকল রানা। ছুটে পাশে চলে এল হাসান। রানার কথা শুনে মাথা ঝাঁকাল সে, ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ার ভেতর।

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে শাফিকে ডাকল রানা। ‘ফাঁকটা পরীক্ষা করেছ?’

‘জী, স্যার।’

ক্রল করে গুহার মুখে চলে এল রানা। পাঁচ গজ দূরে বোল্ডারের আড়ালে ওত পেতে বসে রয়েছে শামিম। ‘শামিম, এসো—টানেলে ঢুকতে হবে।’

থমথমে চেহায়ায় স্বস্তি ফিরে এল, শামিম বলল, ‘সত্যি কি কোন টানেল আছে?’

চার মিনিট পর। গুহার পিছনে, বোল্ডারগুলোর আড়ালে, হাসান একা। গুহার প্রবেশমুখ সাদা, সরু জানালা, ওপর দিকটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে গেছে। বাকি সব অন্ধকার। গুহার মেঝেতে ফাঁকটার দিকে তাকাচ্ছে না সে, তবে গর্তটা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগছে হাতে। এই গর্তের ভেতর তার সঙ্গী ও বন্ধুরা ঢুকেছে, হাতের কাজ সারার পর তাকেও ঢুকতে হবে।

এক ঝাঁক বুলেট ঢুকল ভেতরে, রিকোশে-র আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। প্রবেশমুখের বাইরের আলো অকস্মাৎ লোকজনের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেল, ছুটছে, গুলি করছে বিরতিহীন। বাগিয়ে ধরা হাসানের উজ্জি থেকে এক পশলা উত্তপ্ত সীসা ছুটল। কিনারা ধরে গর্তের ভেতর ঝুলে পড়ল সে, একজোড়া রশি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে অন্ধকার গহবরে।

দু’জন সৈনিক প্রবেশমুখের বাইরের দেয়ালে গা স্টেটে দাঁড়াল, পিন খুলে ভেতরে ছুড়ে দিল দুটো গ্রেনেড। বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ হলো, বাইরে বেরিয়ে এল আলাড়িত ধোঁয়া। নিশ্চিত হবার জন্যে আরও দুটো গ্রেনেড ছুঁড়ল তারা, আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রত্যাশিত আওয়াজের পরিবর্তে প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল, গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এল আগুনের চওড়া শিখা, তাতে বোল্ডারগুলো ঢাকা পড়ে গেল, গুহামুখে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জন পরিণত হলো নিষ্কিণ্ড কামানের গোলায়, নালার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মালভূমিতে। পাথর বৃষ্টির নিচে চাপা পড়ল তারা। গুহাটা অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে এখন নিরেট পাহাড়-প্রাচীর।

রশি বেয়ে বিশ ফুট নেমে এসেছে, এই সময় গর্জনটা শুনতে পেল হাসান। হাতের জোড়া রশি ছিঁড়ে গেল কোথাও। উত্তপ্ত বাতাস তার ভুরু পুড়িয়ে দিল। সে ভাবছে, খারটি সেকেন্ড টাইম পেন্সিল সহ এক কিলো প্লাস্টিক লাইমস্টোনের গুহাটাই শুধু ধসিয়ে দেবে না, গুহার বাইরে যারা থাকবে তাদেরকেও খুন করবে। ভেজা পাথরে খসে পড়ল সে, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল, 'বাবারে!' ফুসফুসে ধুলো ঢুকেছে, মাথার ওপর পাথর খসে পড়ছে। টর্চের হলুদ আলো জ্বলতে দেখল। পাথরগুলো খুদে আকৃতির, খুলি ফাটেনি। পায়ে ব্যথা, তবে শুধু মচকে গেছে, হাড় ভাঙেনি। বুক পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। টর্চের আলোয় সিগারেটের ধোয়া অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। অথচ মাত্র কিছুক্ষণ আগে বাতাসের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়েছিল সে।

'মনে হচ্ছে ছাদ ধসে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, রানার গলার সুর হালকা।' 'ধন্যবাদ, হাসান।'

গর্তের মুখ এত সরু যে নিচে নামতে শামিম আর রিয়াজের সমস্যা হয়েছে। নিচে এসে টানেলটা চওড়া হয়ে গেছে। রানা নির্দেশ দিল, 'শুধু চলার সময় টর্চ জ্বালবে, তা-ও মাত্র একটা।' টানেল অন্ধকার হয়ে গেল। 'শাফি,' বলল ও। 'তোমার পরিচিত এক লোক পাহাড়ের তলা দিয়ে আরেক দিকে বেরুতে পেরেছিল, তাই না? ঠিক কি বলেছিল, শোনাও।'

'দু'বছর আগের ঘটনা....' ইতস্তত করছে শাফি। 'শ্যাফট বেয়ে নিচে নামার পর একটা নদী পায় সে। বলেছিল, অনেকগুলো প্যাসেজ আছে, কিন্তু নদীটা মাত্র একটা প্যাসেজ ধরে এগিয়েছে। খানিক দূর এগোবার পর অন্য একটা প্যাসেজে মিলিত হয়েছে, খানিকটা নিচের স্তরে সেটা। তারপর আরেকটা। অনেক প্যাসেজ কানাগুলির মত, কয়েকটায় পানি আছে। তবে অপরপ্রান্তে বেরুবার পথ অবশ্যই আছে, কারণ তা না হলে লোকটা বেরুতে পারত না। তবে বেশ কয়েকদিন সময় লাগে তার।'

মনে মনে হতাশ বোধ করল রানা। তবে সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে দ্রুত নির্দেশ দিল, 'নাসের আর শামিম, তোমরা নাহিদকে তোলো। আমি সামনে থাকব।'

নাহিদের ক্রাচে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে চেয়ার বানানো হলো। টর্চ জ্বালল রানা। টানেল ধরে রওনা হয়ে গেল ওরা। ভেজা গ্যালারি দেখা গেল, ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। গ্যালারির ছাদ অনেক উঁচু, কোথাও কোথাও টর্চের আলো নাগাল পেল না লাইমস্টোনের দেয়াল বেয়ে পানির ধারা নেমে আসছে। তারপর মেঝেতে নুড়ি পাথর দেখা গেল। চল্লিশ ডিগ্রীর মত কাত হয়ে আছে পথ। দুশো গজ এগিয়ে এসেছে ওরা। রানার কম্পাস পশ্চিম দিকটা নির্দেশ করছে। এরপর গ্যালারি উত্তর দিকে ঘুরে

যেতে শুরু করল। দশ গজও এগোয়নি, টর্চের আলোয় দেখা গেল ছাদ ঢালু হয়ে নিচে নেমে এসেছে, ডুবে গেছে থই থই পানিতে। অর্থাৎ প্রথম প্যাসেজের এখানেই সমাপ্তি। পিছনে বন্ধ হয়ে গেছে শ্যাফট, সামনে এগোবার কোন পথ নেই। নিরেট বাস্তবতাই বলে দিল, জ্যান্ড কবর হবার অপেক্ষায় বসে থাকো এখন।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল হাসান। ইউনিফর্মের বোতাম খুলছে সে। 'পানিতে নেমে দেখা দরকার কত দূর যাওয়া যায়, নতুন কোন প্যাসেজ পেয়ে যেতে পারি।' সদ্য ধরানো সিগারেটের ধোয়া পানির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

‘একটা রশি নাও।’

কোমরে একটা রশি বাঁধল হাসান, ওয়াটারপ্রুফ টর্চটা হাতে থাকল, সাবধানে পা ফেলে নেমে পড়ল পানিতে। পানি এত ঠাণ্ডা, মুহূর্তে কাঁপন ধরে গেল শরীরে। দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটছে। নিচে মেঝে ক্রমশ ঢালু। তিন পা এগোতেই বুকের ওপর উঠে এল শানি। তারপর সাতরাতে শুরু করল সে। গ্যালারির নেমে আসা ছাদ আর পানির মাঝখানে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক বা ফাটল পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে এগোচ্ছে।

দু'সারি দাঁতের ফাঁকে টর্চ আটকে ডুব দিল হাসান।

টর্চের আলো পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। রশিটা এখনও এগোচ্ছে। খানিক পর সেটা স্থির হয়ে গেল ওর হাতে। ভয়ে শিরশির করে উঠল পা। হাসান ডুবে গেল না তো?

রশিটা টানল রানা। পাশে এসে দাঁড়াল শামিম।

হঠাৎ দূর থেকে হাসানের গলা ভেসে এল, সেই সঙ্গে টর্চের আলোও দেখতে পেল ওরা। 'মাসুদ ভাই, চলে এসো।' ব্যাটলড্রেস ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে ভরে পানিতে নামল রানা, বাকি সবাই ওর পিছু নিল। পানি পেরিয়ে চওড়া একটা কার্নিসে উঠল সবাই। রানার নির্দেশে স্টোভ জ্বালানো হলো। কাপড় পরার শক্তি নেই নাহিদের, হাসান তাকে সাহায্য করল। গরম সুপ খেলো ওরা। পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হাসান লক্ষ করল সারফেস ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। ব্যাপারটা চেপে রাখল সে।

পাঁচ মিনিট পর রানা বলল, 'চলো, রওনা হই।' কার্নিসটা আরও চওড়া হয়ে ধাপে ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে। সামনে আবার পানি পেরুতে হলো, তবে মাত্র কোমর সমান উঁচু। মাথা নিচু করে হাঁটছে নাসের, হাত দুটো পকেটে, নাহিদের ক্রাচ ব্যথায় অবশ করে তুলেছে একদিকের কাঁধ। নাহিদের হাতের স্পর্শ মার্বেলের মত ঠাণ্ডা। বিসিআই এজেন্ট মেজর নাহিদ যে মারা যাচ্ছে, নাসেরকে তা বলে দেয়ার দরকার নেই। নির্দিষ্ট কারও ওপর নয়, তবে তার রাগ হচ্ছে প্রচণ্ড। অচেনা এক লোককে কেন আমি বইছি, ওরা কে আমার? ওরা তো দিব্যি আমার বউকে ফেলে চলে এসেছে! সে একজন গেরিলা, জানে যুদ্ধের সময় মূল্যবান অনেক কিছুই বলি দিতে হয়। কিন্তু কিছু জিনিস আছে অমূল্য, এমনকি যুদ্ধের সময়ও বলি দেয়া যায় না। যেমন, তোমার আসন্ন প্রসবা প্রিয় স্ত্রীকে, বা যে সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে তাকে। পাহাড়ের গভীরে মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিল নাসের। যদি বাঁচি, এখন থেকে যাদেরকে ভালবাসি তাদের জন্যে বাঁচব। রানা, শামিম, হাসান—ওদের সবাই ওপর রাগ হচ্ছে তার

গ্যালারি ধরে এগোল ওরা। ঢালের মাথায় গ্যালারির ইতি ঘটল, পাথরের একটা দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রানার টর্চ দেয়ালের মাথার দিকে উঠে গেল। বিশ ফুট ওপরে একটা ফাটল। ফাটল মাত্র এক ফুট চওড়া, ভেতর থেকে গুরু-গম্ভীর একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলে ঢুকে অপরপ্রান্তে তাকাল। চারদিকে টর্চের আলো ফেলে কিছুই দেখা গেল না। শব্দ শুনে বোঝা গেল নিচে কোথাও একটা জলপ্রপাত আছে। শামিম আর হাসানকে রশি নিয়ে ওপরে উঠতে বলল রানা। ফাটলের কিনারা থেকে রশি ফেলেও তল পাওয়া গেল না। 'একজোড়া রশি এক করে নামছি আমি,' বলল ও। 'যদি কোন পথ পাই, রশিতে দু'বার ঝাঁকি দেব। প্রথমে নাহিদকে নামাবে তোমরা।'

নামার সময় দেয়ালের গায়ে কোন গর্ত পেল না রানা। ফাটলের কিনারা থেকে টর্চের আলো ফেলেছে হাসান, কিন্তু রানা এত নিচে নেমে এসেছে, আলোটা নাগাল পাচ্ছে না। পানির গর্জন বজ্রপাতের মত শব্দ করছে। নিজের টর্চটা জেঁলে নিচের দিকে তাক করল রানা। ষাট ফুট নিচে চকচকে কি যেন দেখা যাচ্ছে। চিনতে পারল রানা, জলপ্রপাতই। নদীটা বিশাল, শ্যাফট-এর পাশ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামছে অবিস্মিত ধারায়। নিচে নদী, কাজেই নদীর কিনারা থাকা সম্ভব। আছে কিনা জানতে হলে সবটুকু নামতে হবে।

সাবধানে নামছে রানা, নদীটা আর বেশি নিচে নয়, এই সময় ওর বাম দিকে আরেকটা জলপ্রপাতের অস্তিত্ব ধরা পড়ল। রানা আন্দাজ করল, দ্বিতীয় রশির শেষপ্রান্তে চলে আসছে ও। দেয়াল এখনও মসৃণ। বাম দিক থেকে বাতাসের তীব্র ঝাপটা আসছে, নিচের দিকে ছুটন্ত বিপুল জলরাশি পাহাড়ের গভীর অভ্যন্তরে রীতিমত ঝড় তুলছে। জলকণার তুমুল বর্ষণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডায় হি-হি করছে রানা। শরীরের সমস্ত পেশী অবশ হয়ে আছে। কি হবে, নিচে যদি কোন কার্নিস না থাকে? দেয়ালটা যদি গভীর নদীতে নেমে গিয়ে থাকে?

পিঠে কি যেন ঠেকল। ভয় পেয়ে আঁতকে উঠতে যাচ্ছিল, তারপর উপলব্ধি করল, একটা কার্নিসে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সে। টর্চটা আবার জ্বলল। কার্নিসটা চার ফুট চওড়া, বিশ ফুট লম্বা, সামনেই স্থূপ হয়ে আছে কিছু ভেজা ও চকচকে বোল্ডার। কার্নিসের কিনারা থেকে টর্চের আলো ফেলে এখনও নিচে কিছু দেখতে পেল না। শুধু দিকট গর্জন তুলে অদৃশ্য জলরাশি গভীর খাদে নেমে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, খাদে খরস্রোতা একটা নদী তৈরি হয়েছে, কিন্তু এত নিচে যে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

রশিতে দু'বার ঝাঁকি দিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল রানা, হাঁপাচ্ছে।

ক্রাচটাকে চেয়ার বানানো হয়েছে আগেই, সেটায় বসে নিচে নামল নাহিদ, ওপর থেকে রশি ছাড়ছে শামিম আর হাসান। তারপর নিচে নামানো হলো তিনটে প্যাক, অস্ত্র আর রেডিও। রিয়াজ আর নাসের একসঙ্গে নামল। আশ্চর্যই বলতে হবে, স্ট্র হ্যাটটা আগের মতই রিয়াজের মাথায় সাঁটা। তারপর নামল শাফি আর হাসান, সবশেষে শামিম।

সিঁধে হলো রানা, নাড়াচাড়া করে আঙুলের আড়ষ্ট ভাবটা কাটাচ্ছে বড় একটা বোল্ডারে রশি পেঁচিয়ে আবার নেমে গেল কার্নিসের কিনারা থেকে।

এবারের নামাটা তেমন কঠিন হলো না। পা রাখার মত খাঁজ আর গর্ত পাওয়া গেল। চল্লিশ ফুট নামার পর টর্চের আলোয় কুয়াশা দেখতে পেল রানা, কুয়াশার নিচে হলদেটে জলপ্রপাত। আরও বিশ ফুট নামার পর পায়ের তলায় শক্ত পাথর পেল। চারদিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারল, এটা কার্নিস নয়। পানির গর্জনই বলে দিল, জলপ্রপাতের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা সৈকতে।

রশিতে দু'বার ঝাঁকি দিল রানা। তারপর টর্চ জ্বেলে ঘোড়ার নাল আকৃতির সৈকতটা পরীক্ষা করার জন্যে এগোল। নাল-এর ডান বাহুর শেষ মাথায় নিরেট দেয়াল, বাম বাহুর শেষ মাথায় খুদে একটা ফাঁক। ফাঁকটা এত সরু, ভেতর দিয়ে মানুষ গলবে না। তবে নদীর আলোড়িত পানি ঢুকছে ভেতরে, স্রোত তেমন জোরাল নয়।

প্রথমে ওরা নাহিদকে নামাল। তারপর বাকি সবাই নেমে এল প্যাক ও অস্ত্র নিয়ে। পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলল রানা। দুশো ফুট ওপর থেকে নামছে জলপ্রপাতের ধারা, নদীতে এতবেশি স্রোত যে ওরা কেউ নামা মাত্র হারিয়ে যাবে অজানা পথে। সৈকত ধীরে ধীরে ডুবছে, অর্থাৎ নদীর উচ্চতা বাড়ছে। নেমে রশি খুলে নেয়ার পর এখন আর ওদের পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। এই সৈকত থেকে বেরিয়ে যাবারও অন্য কোন পথ নেই। সবশেষে খুদে ফাঁকটার কথা বলল বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ওই ফাঁকের ভেতর ঢুকতে হবে ওদেরকে, তার আগে ভেতরে ঢোকার জন্যে জেলিগনাইট ফাটিয়ে চওড়া করতে হবে গর্তের মুখ।

রানা থামতেই কাজ শুরু করে দিল হাসান। খুব অল্প প্রাস্টিক ব্যবহার করল সে, তা না হলে পাথর ধস শুরু হতে পারে। ফাঁকটার মুখ বড় হলো। কোমর সমান পানিতে ন্যুমল রানা। টর্চ জ্বেলে দেখল ওর সামনে অন্ধকার একটা টানেল। পিছু নিল সবাই, জানে না এই জলমগ্ন টানেল কোথায় নিয়ে যাবে ওদেরকে।

টানেলের মেঝে ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। এক সময় দু'পাশে দুটো শাখা-টানেল দেখল ওরা, দুটোর মেঝেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ওগুলোকে এড়িয়ে সোজা এগোল রানা। দশ মিনিট হাঁটার পর পানি থেকে উঠে এল দলটা। গায়ে বাতাস লাগছে, অনুভব করে পরম স্বস্তিবোধ করল সবাই। আরও মিনিট দশেক হাঁটার পর টানেলের উন্মুক্ত, আলোকিত মুখ দেখা গেল।

টানেলের বাইরে ছোট একটা উপত্যকা। পশ্চিমা বাতাসে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, আকাশ প্রায় ঢাকা। আশপাশে গাছপালা আছে, কোন ঘর-বাড়ি বা লোকজন নেই। বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়ার জন্যে এখানেই থামার নির্দেশ দিল রানা। শামিম আগুন জ্বালল, সুপ তৈরি করবে। তোবড়ানো স্ট্রি হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে রেডিও নিয়ে বসল রিয়াজ, পরীক্ষা করে দেখছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

নাহিদকে সুপ খাওয়াল হাসান। কেউই পুরোপুরি সুস্থ বা সতেজ নয়, কিন্তু নাহিদের অবস্থা খুবই করুণ। গায়ের রঙ হয়েছে বাদামী কাগজের মত, হাত দিলে পুড়ে যেতে চায় হাত। চোখ দুটো চকচক করছে। সুপ খেলো বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে ফেলে দিল সব। 'ব্যথা!' চোখ বুজে অস্ফুটে বলল সে। 'রানা ভাই!' মাঝে মধ্যে দাঁতে দাঁত পিষছে।

কাছে সরে এসে তার বুকে হাত রাখল রানা। 'আমার ওপর ভরসা রাখো,

নাহিদ। যদি বাঁচি, প্রথমে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।’

‘হ্যাঁ, এই মাসুদ রানাকেই আমি চিনি,’ চোখ খুলল নাহিদ, আধবোজা। ‘হাল ছাড়তে রাজি নও। কিন্তু, রানা ভাই, যার সময় হয়ে গেছে, তাকে তুমি ধরে রাখবে কিভাবে?’ হাসতে গিয়েও পারল না। ‘আমাকে রেখে চলে যাও তোমরা। প্লীজ!’

‘পাগল!’ জোর করে হেসে উঠল রানা, নিজের কানেই বেসুরো লাগল আওয়াজটা। ‘হাসান!’

সিরিজ হাতে এগিয়ে এল হাসান। ‘তোমাকে ফেলে যাব? জান থাকতে নয়।’ দ্রুত ইঞ্জেকশন পুশ করল। ‘ব্যাভেজটা এখনি বদলে দিচ্ছি। ব্যথা কি খুব বেশি, নাহিদ?’

‘নাহ!’ অবিশ্বাস্য সহ্য ক্ষমতা, অবিশ্বাস্য সাহস। ‘এখন আর কিছুই অনুভব করছি না।’

দ্রুত হাতে পুরানো ব্যাভেজ খুলে নতুন ব্যাভেজ বেঁধে দিল হাসান। ক্ষতটা দেখল রানা। চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, তবে মনটা কেঁদে উঠল। নাহিদ ওদের দীর্ঘদিনের বন্ধু, বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট, ব্যক্তিগতভাবে নিজের একটা হাত বা পায়ের বদলে হলেও নাহিদকে বাঁচাতে চাইবে ও। কিন্তু বিধাতার বোধহয় ইচ্ছে নয় ওকে বাঁচিয়ে রাখেন।

চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল নাহিদ, তাকে নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দিতে চাইছে। রানার হাত ধরে খানিকটা দূরে সরে এল হাসান। ‘কেমন বুঝলে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘এখনও টিকে আছে কি করে তাই ভাবছি।’

‘এই জায়গা ছেড়ে দু’ঘণ্টা নড়ছি না আমরা,’ বলল রানা। ‘এই দু’ঘণ্টা নাহিদকে আমি বিশ্রাম দিয়ে দেখতে চাই কোন উপকার পাওয়া যায় কিনা। শাফিকে জিজ্ঞেস করেছি, সে জানে আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি। তার ধারণা, ইসরায়েলি সৈন্যরা ধরে নিয়েছে আমরা বেঁচে নেই।’

ভান করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নাহিদ। ইঞ্জেকশনের প্রভাব। বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে শামিম, জেগে না ঘুমিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। শাফি আর নাসের নাক ডাকছে। একা শুধু রিয়াজ জেগে আছে, এখনও রেডিওর কলকজা নাড়াচাড়া করছে। রানা জানতে চাইল, ‘ওটা কি নষ্ট হয়ে গেছে?’ রিয়াজ টের পায়নি, কোন শব্দ না করে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ও।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল রিয়াজ, হাতের আঙুল একটা বোতামে চাপ দিল দ্রুত। ইভিকেটর লাইট নিভে গেল। রানার মাথার পিছনে সড় সড় করে খাড়া হয়ে গেল চুল। গলার স্বর পাল্টে গেল, আশ্চর্য শান্ত সুরে জানতে চাইল, ‘রিয়াজ? কি করছ?’

‘ইকুইপমেন্ট টেস্ট করছি।’

রানা বলল, ‘ট্রান্সমিট না করলেই হলো।’

‘আপনার নির্দেশ আমার মনে আছে,’ চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে বলল রিয়াজ। স্ট্র হ্যাটটা কপালের আরও ওপরে তুলে দিয়ে একটা বোল্ডারে হেলান দিল। ধীর পায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তের দিকে হেঁটে এল রানা। বৃষ্টি হচ্ছে না। মেঘও কেটে যাচ্ছে। একটু পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিল। হাতঘড়ি

দেখল রানা। আর চার ঘণ্টা পর অন্ধকার নামবে। রাতে শীত আরও বাড়বে। খোলা আকাশের নিচে নাহিদকে বাঁচানো যাবে না।

নাহিদই রানার একমাত্র দুশ্চিন্তা নয়। পাহাড়ের তলা দিয়ে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু সৈকতে পৌঁছতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে। মোবারককে দরকার ওদের। সৈকতে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সে। ওরা মারা গেছে বা যায়নি, ইসরায়েলি সৈন্যরা যাই বিশ্বাস করুক, সৈকতে পৌঁছানোর সবগুলো রাস্তায় টহল দেবে ওরা।

১ বিশ্রাম নেয়া দরকার, কিন্তু খুঁতখুঁতে একটা ভাব অস্থির করে তুলেছে রানাকে। গাছপালার ভেতর হাঁটাচাঁটা করছে ও। এক সময় হালকা জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এল। ওর নিচে একটা মালভূমি, খাড়াভাবে নীলচে ধোঁয়াটে উপত্যকার গভীরে নেমে গেছে। সূর্য আবার বেরিয়ে এসেছে মেঘের আড়াল থেকে। তবে আকাশ, মেঘ বা সূর্যের দিকে তাকিয়ে নেই রানা। পিছিয়ে এসে কয়েকটা পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে ও, চোখে বিনকিউলার। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। মালভূমির নিচের স্তরে কি যেন একটা নড়ছে। উইভজ্জীনে রোদ লাগায় ঝিক করে উঠল কাঁচ। একটা নয়, কয়েকটা। হাফ-ট্রাক, ট্রাক ও ভ্যান-তিনটে গাড়ি। ভ্যানের ছাদে ইম্পাতের একটা লুপ রয়েছে।

চিনতে পারল রানা। ওটা আসলে একটা রেডিও-ডিরেকশন-ফাইন্ডিং ভ্যান।

রানার মনের পর্দায় জ্বলে উঠল ছোট্ট লাল একটা বিন্দু-রিয়াজের রেডিওতে ঘন ঘন জ্বলতে-নিভতে থাকা ট্রান্সমিট লাইট। রিয়াজ ইকুইপমেন্ট চেক নয়, ট্রান্সমিট করছিল। অনেক কিছুই খাপে খাপে মিলে যেতে লাগল। বৃষ্টি হোক বা না হোক, তার স্ট্র হ্যাট পরে থাকার সঙ্গে স্টাইল বা সৌখিনতার কোন সম্পর্ক নেই। ওই হ্যাট আসলে একটা চিহ্ন-ওর পরিচয়। ইসরায়েলি সৈন্যদের ওপর নির্দেশ আছে-স্ট্র হ্যাট পরা লোকটাকে গুলি করবে না, সে আমাদের লোক।

এক মাইল দূরেও নয়, মালভূমির গোড়া থেকে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে আসছে তিনটে আর্মারড কার, সবুজ ও লম্বা ঘাসে প্রায় ঢাকা। পিছিয়ে জঙ্গলের আরও ভেতরে চলে এল রানা।

নালায় রিয়াজ ছাড়া বাকি সবাই ঘুমাচ্ছে। এখনও রেডিও নিয়ে পড়ে আছে সে। রানা তার দিকে তাকালই না। শামিম নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, কাঁধে হাত রাখতেই চোখ মেলে তাকাল। ‘জলদি,’ ফিসফিস করল রানা। ‘ইসরায়েলিরা আসছে। তিনটে আর্মারড কার। পাঁচশোর মত সৈন্য। কান পাতে।’

উঠে বসল শামিম। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা ঝাঁকাল। ইতিমধ্যে ওখান থেকে সরে গেছে রানা।

একটা বোল্ডারে বসে আছে রিয়াজ। নার্ভাস বোধ করছে। ক্যাম্পের সবাব ঘুমাবার কথা, অথচ নড়াচড়া করছে তারা। দু’পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল সে, উপত্যকায় চোখ বুলাল, ঘাড় ফিঁদিয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা জলপ্রবাহের দিকে তাকাল। ক্যাম্পের লোকজন যুদ্ধ করবে। উজি নাড়াচাড়া করার ধাতব আওয়াজ পাচ্ছে সে। খানিক পরই শুরু হয়ে যাবে প্রচণ্ড গোলাগুলি। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত

করার জন্যে ইসরায়েলিদের পক্ষে কাজ করছে সে। কিন্তু হঠাৎ ভয় ঢুকল মনে—মাথায় স্ট্র হ্যাট থাকলেই মর্টার, গ্রেনেড আর মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ার থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় না।

বোল্ডার থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে হাঁটছে রিয়াজ। শান্তি মিশনের লোকজনকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারলেই হয়, সময় মত ইসরায়েলি এম.পি. হেডকোয়ার্টারে গিয়ে টাকাটা সংগ্রহ করে তেল আবিবে চলে যাবে। দশ হাজার মার্কিন ডলার পাবার কথা তার।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে রিয়াজ, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল কি যেন তার পিছু নিয়ে আসছে। তলপেটে শূন্য একটা অনুভূতি জাগল। মনে হলো এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। ছুটন্ত বুটের শব্দও ভেসে আসছে। মাথার স্ট্র হ্যাটটা একহাতে ধরে আছে, গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোমাদের লোক! ইনফর্মার!'

হ্যাটে হাত রেখে চিৎকার করার সময় ছোট্টা গতি কমে গিয়েছিল। তখনই ঝাঁকি খেলো রিয়াজ। পিছনে, পাজরের খাঁচার বা দিকে খুব জোরে কি যেন আঘাত করেছে। ছিটকে সামনে বাড়ল সে। কানের পাশে একটা গলা পেল, 'ওরে পিশাচ, পালাচ্ছিস কোথায়? লায়লার কথা মনে পড়ে গেল, তাই সামান্য একটা খোঁচা মেরেছি।' নাসেরের গলা শুনে রিয়াজ হতভম্ব, বিমূঢ়। ভাবছে, এখন কি হবে?

পাজরের আঘাতটা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই রিয়াজের। ব্যাটা এত বেশি, সহ্য করার মত নয়, যেন গরম লোহা ঢোকানো হয়েছে। তার কি হার্ট অ্যাটাক করল? ডাক্তার সাবধান করে দিয়েছিল, ওজন কমাও। কিন্তু যুদ্ধ করতে এসে হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে হবে, এ কেমন কথা! ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল শরীরে। শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে, ফুসফুস তরল পদার্থে ভরে আছে। খক খক করে কাশল। মুখ থেকে হড়হড় করে কি যেন বেরিয়ে আসছে।

রক্ত।

পিছন থেকে সামনে চলে এল নাসের। হাতে একটা ছুরি, গাছের পাতা কুড়িয়ে ফলা থেকে রক্ত মুছছে। নাসের আমাকে ছুরি মেরেছে, ভাবল রিয়াজ। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল। কি আশ্চর্য, আমি তাহলে মারা যাচ্ছি!

রিয়াজ পড়ে গেল। পড়ার পর তিন সেকেন্ডও বাঁচল না।

চার

আর্মারড কার ভর্তি সৈন্য জঙ্গলের কিনারা থেকে খানিকটা পিছনে থামল, এখন তাদের অপেক্ষার পালা। মিলিটারি পুলিশের ডিটেক্টর ভ্যান জায়গা মত পজিশন নিচ্ছে, যাতে করে রেডিওর পজিশন পিনপয়েন্ট করা যায়। এরপর অনুপ্রবেশকারী বিদেশী অনুচরদের ঘেরাও দিয়ে কচুকাটা করা হবে। মিলিটারি পুলিশরা ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাড়াহুড়া করতে গিয়ে অপারেশনটার বারোটা বাজানোর ইচ্ছে

তাদের নেই। এমন সব গুজব তাদের কানে গেছে, এই বিপজ্জনক লোকগুলোকে খতম করার জন্যে কোন রকম ঝুঁকি নেয়া চলে না। যুক্তিই বলে দেয়, এদের ব্যবস্থা করতে হলে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়া চলবে না। সেজন্যেই বড় একটা দল নিয়ে এসেছে তারা।

ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশের কমান্ডার, একজন মেজর, অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির মানুষ, হিববুল্লাহ মিলিশিয়াদের প্রতি তার অন্ধ আক্রোশ আছে। মিলিটারি পুলিশদের পজিশন নিতে বলে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে।

একটু পরই জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন লোক। আসলে চারজন লোক হাঁটছে, বাকি একজনকে ক্রাচ দিয়ে বানানো স্ট্রেকে তুলে বয়ে আনা হচ্ছে। স্ট্রেকে শোয়া লোকটার পরনে সাদা আলখেল্লা, বাকি তিনজন ঢোলা সালায়ার আর জোব্বা পরে আছে। পঞ্চম ব্যক্তির মাথায় স্ট্র হ্যাট, পরনে ট্রাউজার আর শার্ট। সে সবার পিছনে রয়েছে, একমাত্র তার হাতেই একটা উজ্জি মেশিনগান—দলের বাকি সবার পিঠের দিকে তাক করা।

আর্মারড কার-এর দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ইসরায়েলি মেজরের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হাসি উপহার দিল। ‘শত্রুরা সারেন্ডার করেছে, মেজর। আমার দায়িত্ব শেষ, এবার যা করার আপনিই করবেন।’

বন্দী চারজনকে দেখল মেজর। ‘সব মিলিয়ে লোক থাকার কথা ছ’জন। আরেকজন কোথায়?’

‘ওদের একজন পাহাড়ের তলায় রয়ে গেছে,’ স্ট্র হ্যাট পরা লোকটা জবাব দিল। ‘ওখানে থাকাই তার কপালে ছিল।’

‘গুড,’ বলল মেজর। আর্মারড কার থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল। ‘ইরাজ ও আরসালান, মেশিন গানটা নিয়ে এসো। আহুদ, রেডিওতে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাও, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কেফার ভিটকিনে আছেন মোসাদ ইন্টারোগেটর অফিসার আহুদ, তিনি হয়তো বন্দীদের ইন্টারোগেট করতে চাইবেন।’ ভুরু কুঁচকে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল। ‘অফিসার আহুদ একজন সিভিলিয়ান, মেয়েদের নখ উপড়াতে এক্সপার্ট।’ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল। ‘নর্দমার কীটদের জন্যে উপযুক্ত শাস্তি একটাই—এক গুলিতে জান কবচ। এসো।’

আর্মারড কার থেকে পঁচিশ গজ দূরে তেপায়ার ওপর মেশিন গান বসাল ওরা, তাক করল লাইমস্টোনের নিচু পাঁচিলের দিকে। ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন সৈন্য ফিল্ড-গ্রে ড্রেস পরে আশপাশে ঘুর ঘুর করছে, এরা নিজেদের গাড়ি রেখে ঢাল বেয়ে হেঁটে এসেছে।

‘গুড,’ স্ট্র হ্যাটকে বলল মেজর। ‘এবার ওদেরকে মাটি খুঁড়তে বলো।’

‘মাটি খুঁড়তে...’

‘বেশি গভীর করার দরকার নেই,’ বলল মেজর। ‘চল্লিশ সেন্টিমিটারই যথেষ্ট।’

আর্মারড কারের পিছন থেকে কোদাল আর শাবল নামিয়ে ছুঁড়ে দিল এম.পি. পুলিশ। মাটি খুঁড়তে শুরু করল রানা। দেখাদেখি কাজে হাত লাগাল নাসের ও হাসানও। শারফি হাঁটু গেড়ে মাটি সরাজে, সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায়

ফিসফাস করছে, মেজর বিরক্ত হবে বুঝতে পেরে ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে গেল তারা। 'গুড,' পনেরো মিনিট পর বলল মেজর, 'উঁকি দিয়ে গর্তের গভীরতা পরীক্ষা করল।' 'এবার ওদেরকে কাপড় খুলতে বলো।'

ধীরে ধীরে কাপড় খুলল ওরা। ফিল্ড-গ্রে ইউনিফর্ম পরা সৈন্যরা কাছাকাছি কেউ নেই। হিযবুল্লাহ মিলিশিয়া সন্দেহে অনেক নিরীহ মুসলমানকে আগেও এভাবে জ্যান্ত কবর দিতে দেখেছে তারা। ব্যাপারটা শুধু রোমহর্ষকই নয়, নৃশংসও বটে। কাজেই চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। আজ তারা শুধু চোখ ফিরিয়ে নেয়নি, ঢাল বেয়ে গাড়ির কাছে ফিরে গেছে। গাছের ডালে ডালে পাখি ডাকছে, গর্তের কাছে শুধু বন্দীরা আর জন্মদাবাহিনী। মেশিনগানের পিছনে ও পাশে তিনজন মিলিটারি পুলিশ; কাছাকাছি রয়েছে মেজর আর দু'জন অতিরিক্ত এম.পি.। ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন বন্দী। রানা হিব্রু ভাষায় জানতে চাইল, 'শেষ ইচ্ছে বলে একটা কথা আছে, সেটা কি পূরণ করা সম্ভব? আমি একটা সিগারেট খেতে চাই।'

স্ট্র হ্যাট পরা লোকটা বলল, 'ওদেরকে সিগারেট দেয়া হোক

'বেঈমান আর শত্রুদের প্রতি তোমার দরদ একটু বেশিই দেখা যাচ্ছে,' তিক্ত গলায় বলল মেজর।

স্ট্র হ্যাট এগিয়ে এসে রানাকে একটা সিগারেট দিল, লাইটার জ্বেলে ধরাতেও সাহায্য করল। এক মুহূর্তের ছোট্ট একটা ঘটনা, কিন্তু মেজরের মনে হলো এই এক মুহূর্তেই মারাত্মক আরও কি যেন একটা ঘটে গেছে।

সেটাই মেজরের শেষ অনুভূতি। কারণ সিগারেট দেয়ার সময় স্ট্র হ্যাট তার নিজের উজ্জিটা নগ্ন রানার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। রানার হাতে অস্ত্রটা আগুন ঝরাতে শুরু করল, সরাসরি মেশিন গান ত্রুদের লক্ষ্য করে। বুলেটে ঝাঁঝরা শরীরগুলো ছিটকে পিছিয়ে গেল, মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। বাকি থাকল মেজর, হোলস্টার থেকে ল্যুগারটা অর্ধেকও বের করতে পারেনি। উজ্জিটা ঘুরে গেল, কিন্তু ফায়ারিং পিন খালি চেম্বারে লেগে ক্লিক করে আওয়াজ করল শুধু, কোন বুলেট বেরুল না।

গুলি বেরুবার অপেক্ষায় থাকেনি মেজর, ঘুরে ছুটতে শুরু করেছে। বেশি দূর যেতে পারল না, বেল্ট থেকে ছুরিটা বের করে সজোরে ছুড়ে মারল শামিম রোদ লেগে ঝলসে উঠল রূপালি ইম্পাত। ব্যাটল ড্রেস পরা মেজর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, তারপর টলতে টলতে কয়েক পা সামনে বাড়ল। সবশেষে সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। সৈনিকদের ইউনিফর্ম খুলে পরতে শুরু করল রানা আর হাসান। মেজরের ইউনিফর্ম রাস্তার গায়ে পুরোপুরি ফিট করল।

লাশগুলো গর্তে ফেলে দ্রুত মাটি চাপা দিল ওরা। আর্মারড কার-এ নিজেদের প্যাক আর অস্ত্র তুলল। শিরদাড়া খাড়া করে বসে আছে রানা, টারেট-এর বাইরে মাথা, কামানো মুখ থমথমে। 'গো,' নির্দেশ দিল তরী গলায়।

থ্রটলে পা রাখল হাসান। পাহাড়ের নিচে নেমে এসে বাকি দুটো গাড়ির সঙ্গে যোগ দিল আর্মারড কার। সাধারণ সৈন্যরা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। তারা জানে মেজরের নেতৃত্বে ইসরায়েলি মিলিটারি পুলিশ পাহাড়ের ওপর ঠাণ্ডা

মাথায় কি কাও করে এসেছে। উপত্যকায় নেমে এসে আর্মারড কার পাকা রাস্তায় পড়ল, কেফার ভিটকিনের দিকে ছুটে চলেছে।

কেফার ভিটকিনের বাসিন্দারা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর আর্মারড কার দেখে বিচলিত বা সচকিত হলো না, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ি-ঘরের দিকে না ফিরে নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে রানা, শাফিকে বলল, 'নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার আমাদের। কোন গুহা-টুহা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল শাফি। শহরের ঠিক বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'এখানে ঘোরান।' হাত তুলে ডান পাশটা দেখাল।

বাঁক ঘুরে মেইন রোড ত্যাগ করল রানা, সরু একটা গলি ধরে এগোল গাড়ি, সামনে দেখা যাচ্ছে লোহার একটা গেট, গেটের দুই কবাটের মাঝখানে লোহার চেইন, চেইনের সঙ্গে তাল ঝুলছে। তালার গায়ে সীল-গালা, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর প্রতীক চিহ্ন চিনতে অসুবিধে হলো না। নিচে নেমে চেইন কাটল শাফি, আর্মারড কার ভেতরে ঢোকার পর ভাঙা চেইনের লিঙ্ক জোড়া লাগাল, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল গেট।

গেটের ভেতর একটা ফার্মহাউস। দেখেই বোঝা গেল, 'তাড়াহুড়ো করে জায়গাটা খালি করে চলে গেছে সবাই। ফার্মহাউসের জানালাগুলো খোলা, একটা কবাট সাগর থেকে ছুটে আসা বাতাসে বাড়ি-খাচ্ছে পাশের দেয়ালের সঙ্গে। গবাদি পশুর শেডগুলো খালি।

'মিলিটারি পুলিশ বা ইন্টেলিজেন্স-এস লোকজন মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়েছে এখান থেকে। শুধু এই একটা নয়, শহরতলির কোন ফার্মেই মুসলমানদের থাকতে দেয়া হয়নি।'

জায়গাটা ঘুরে-ফিরে দেখল রানা। শেডে প্রচুর খড় দেখা গেল। বাড়ির ভেতর বেড়রুমে এখনও চাদর আর বালিশ রয়ে গেছে। কিচেনে পাওয়া গেল রিফ্রিজারেটর; তাতে সজি, মাংস, জেলি, পনির ও মাখন রয়েছে।

বাড়িটা থেকে বা ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে যাবার পথগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। হালকা গাছপালার ভেতর বাড়িটা, চারধারে ছোট-বড় নালা ও লম্বাটে গর্ত আছে। সবচেয়ে কাছের বাড়ি দুশো গজ দূরে, এখান থেকে সেটার দেয়াল শুধু দেখা যায়, খালি-কোন জানালা-দরজা নেই।

আর্মারড কারটা গোলাঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। কিচেনে জড়ো হলো সবাই, চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল রানা। পায়ের চারপাশে মাছি ভন ভন করছে। পশ্চিমে হেঁপে পড়ছে সূর্য, হলদেটে রোদ, মোচড় খাচ্ছে নীলচে ধোঁয়া। রানার মনে হলো একটানা এক বছর ঘুমাতে পারলে তবে যদি ক্লান্তি দূর হয়।

নিস্তর্রতা ভেঙে নাসের বলল, 'কাফেতে যাওয়া দরকার।'

বিপদের কথা ভাবছে রানা। 'কিন্তু আপনার স্ত্রী যদি মুখ খুলে থাকে, তাহলে?' মনে মনে ভাবছে, নাসেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলে স্বস্তিবোধ করত।

'মুখ খুলে থাকুক বা না থাকুক, ঝুঁকিটা আমাদের নিতেই হবে,' জবাব দিল

নাসের।

অনেক আগে থেকেই নাসেরকে দুর্বল একটা লিঙ্গ বলে মনে করছে রানা। তবে এ-ও সত্যি, রিয়াজকে পালাতে দেখে সে-ই তাকে ছুরি মারে। অবশ্য, নাসেরের সততা এই মুহূর্তে কোন প্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গ হলো মোবারককে খুঁজে বের করা। সত্যি দুঃখিত, মনে মনে বলল রানা-তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

ওদের চোখের আড়ালে নাসের কি ভূমিকা পালন করবে, বলা সম্ভব নয়। সে যদি স্ত্রীর প্রাণের বিনিময়ে ওদেরকে ধরিয়ে দেয়ার চুক্তি করে ইসরায়েলিদের সঙ্গে?

রানার চোখ দেখে মনের কথা পড়ে ফেলল হাসান। শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'কাফেতে আমি যাব। আমি একা।'

দশ মিনিট পর কেফার ভিটকিন থেকে পশ্চিম দিকে রওনা হলো ওরা, বন্দরে যাচ্ছে। শ্রমিকদের জন্যে নির্ধারিত নীল ক্যানভাস স্যুট আর কালো বেরেট পরেছে হাসান, ফার্মহাউসের ওয়ার্‌ড্রোব থেকে পেয়েছে। সঙ্গে করে কাগজ-পত্র নিয়ে এসেছে, নিজেকে স্থানীয় বাসিন্দা বলে পরিচয় দিতে অসুবিধে হবে না। নাসেরের পরনে নীল ট্রাউজার, মাথায় বেরেট; তার কাগজ-পত্রেও কোন খুঁত নেই। তবে সবার কাপড়ই নোংরা, রানা ছাড়া কেউই দাড়ি কামায়নি বা গোসল করেনি। কাঁচা রসুন চিবচ্ছে ওরা, আঙুলের ফাঁকে কাদা মাখিয়েছে। সবাই ভাববে খেত থেকে বেরিয়ে সরাসরি কাফেতে যাচ্ছে।

পথে একটা মেয়েকে দেখল হাসান। সুন্দরী না হলেও, চোখ দুটো ভারি সুন্দর, মাথায় লম্বা কৌকড়া চুল। চোখাচোখি হতে হাসল হাসান। মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে নিল।

বন্দরের উত্তর দিকে দুই সরু গলির মুখে গোল্ডফিশ কাফে। একটা গলিতে ঢুকে হাঁটছে ওরা, শেষ মাথায় মোটরসাইকেলে বসা দু'জন ইসরায়েলি সামরিক অফিসারকে দেখা গেল। পার্কিং এরিয়ায় মোটরসাইকেল থামিয়ে সিগারেট টানছে তারা, কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর একটা আর্মারড কার নিখোঁজ হয়েছে, এ-খবর এখনও তারা পায়নি, পেলো এখানে এভাবে অলস সময় কাটাতে পারত না।

কাফের সামনে এসে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল নাসের। 'ভেতরে ঢুকুন,' বলল হাসান, সুরটা প্রায় কঠিন। নাসের ইতস্তত করেছে দেখে দরজাটা খুলে তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

গোল্ডফিশ কাফে বিশ-বাইশ ফুট লম্বা। ভেতরের কোণে একটা বার। জনা বিশেক লোক বসে আছে, মেয়ের সংখ্যা পাঁচ কি ছয়। কোণের এক টেবিলে বসে দাবা খেলছে দু'জন সৈনিক। তাদেরকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল নাসের। হাসান তার হাতে খোঁচা মারল, ফিসফিস করে বলল, 'ক্যামোফ্লেজ।' বলল বাটে, তবে নিশ্চিতভাবে নিজেও জানে না।

টোক গিলল নাসের, কণ্ঠা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। ভিড় ঠেলে বার-এর দিকে এগোল সে। আলখেল্লা বা ঢোলা জোকা পরা এক মধ্যবয়স্ক লোকের পাশে

এসে দাঁড়াল। লোকটার চোখ দুটো টকটকে লাল, গৌফ জোড়া অস্বাভাবিক চওড়া, মাথায় বেরেট। বার-এর পিছনে দাঁড়ানো মোটাসোটা লোকটাকে নাসের বলল, 'আমাকে আর আমার বন্ধু অ্যাডমিরালকে কফি দাও হে।'

বারম্যান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখল নাসেরকে। 'ইস্রাফিল?'

'আফলাতুন,' বিড়বিড় করল নাসের। লেবানিজ রেডিও পাস ওয়ার্ড প্রচার করেছে, সন্দেহ নেই। নাসেরের ভয় অবশ্য কাটল না। বারম্যান হিব্বুল্লাহ মিলিশিয়ার ইনফর্মার, জানে সে; কিন্তু তা সত্ত্বেও চেইনের পরবর্তী লিঙ্ক জোড়া লাগাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

বারম্যান কফি পরিবেশন করল, তারপর কাগজে পেন্সিল ঘষে ঘষে বিল লিখল। কাগজটা নিয়ে হাসানকে দিল নাসের। বিলে লেখা রয়েছে—মোহাম্মাদ মোবারক হোসেন, ১৩, ডামুর, মোহরার। পকেট থেকে টাকা বের করল হাসান, টাকার সঙ্গে বিলটাও ফিরিয়ে দিল বারম্যানকে। টাকাটা দেবাজে রাখল সে, বিলটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে।

'দোয়া করি আপনারা সফল হন। গুজব ছড়িয়েছে পাহাড়ে ওদের ছ'জন মারা গেছে...'

চমকে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল নাসের।

'বিলটা আমি দেখলাম,' বলল লোকটা। 'আমি হিব্বুল্লাহ কম্যান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ...'

'একটু পর কারফিউ শুরু হবে,' বলে নাসেরের হাত ধরে টান দিল হাসান।

'এখানে আমাদের আরও লোকজন আছে, প্রয়োজনে...'

নাসেরকে ঠেলে কাফের দরজার দিকে এগোল হাসান। এরচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি আর হতে পারে না। এরইমধ্যে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর লোকজন খুন হবার কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোন মুহূর্তে তল্লাশী শুরু হবে।

কাফে থেকে বেরিয়েই হাসানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাসের। এক লোকের সঙ্গে কথা বলছে সে। লোকটা খাটো, গায়ে ওভারকোট, মাথায় উলেন টুপি। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল হাসান, কারণ লোকটাকে আলিঙ্গন করছে নাসের। তার গলা থেকে যে শব্দটা বেরিয়ে আসছে সেটা হাসির নাকি কান্নার, বোঝা গেল না। মাথার বেরেট চোখের ওপর নামিয়ে এনে আরেক দিকে এগোল হাসান।

হঠাৎ করে খাটো লোকটা হিব্রু ভাষায় বলল, 'কসম লাগে, চুপ করো!' এমন ঝাঁকি খেলো হাসান, যেন গুলি খেয়েছে। চেহারায় অবিশ্বাস, হাঁ হয়ে গেছে। 'শান্ত হও। পুরুষমানুষের মত আচরণ করো।'

খাটো লোকটা আসলে পুরুষ নয়, মেয়ে—লায়লা।

হাসান বলল, 'নাসের, এখান থেকে আমাদের বেরুতে হবে।'

মাথা নাড়ল লায়লা। 'আমি নই, আপনারা।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল নাসের, স্ত্রীর কথা বুঝতে পারছে না। আনন্দে পানি বেরিয়ে এসেছে চোখে, লায়লার চেহারা উদ্ভাসিত লাগছে, যেন কোন দেবী।

'যাও, নাসের, সময় নষ্ট করো না,' ফিসফিস করল লায়লা।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল হাসান। লায়লাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও তাজা

লাগছে। শরীরের কোথাও নির্যাতনের চিহ্নমাত্র নেই। নয়মাস চলছে তার। ভরাট স্বাস্থ্য। লক্ষণ ভাল বলার উপায় নেই। ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়েছিল মেয়েটা, অথচ ওরা তার কোন ক্ষতি করেনি। 'আমরা শুনেছি আপনাকে ওরা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ঠিকই শুনেছেন।' গলির দু'দিকে দ্রুত চোখ বুলাল লায়লা। আশপাশে কেউ নেই। গোধুলির ছায়া দ্রুত গাঢ় হচ্ছে। 'তবে আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। পেটে বাচ্চা তো, তাই।'

লায়লাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল হাসান। 'ঠিক কি ঘটেছে?'

'ওরা আমাকে হাজারটা প্রশ্ন করল। বললাম কিছুই আমার জানা নেই। নিজেদের মধ্যে তর্ক করল ওরা-পেটে বাচ্চা নিয়ে কোন মেয়ে মিথ্যে কথা বলবে না। কাজেই ছেড়ে দিল।' হাসছে লায়লা।

'এখানে আমরা আসব, আপনি তা জানলেন কিভাবে?'

'কেফার ভিটকিনে আসছেন, এ তো জানা কথা। আর কেফার ভিটকিনে তথ্য পাবার একটাই উৎস-গোল্ডফিশ। আশেপাশে পঞ্চাশ বর্গ মাইলে বিশ হাজার হিবুল্লাহ গেরিলা লুকিয়ে আছে, মোবারকই তাদের লিয়াজোঁ...'

'তাই?' গোটা ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য লাগছে হাসানের। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এত সহজে ছেড়ে দিল কেন লায়লাকে? একটাই কারণ থাকতে পারে, লায়লাকে তারা অনুসরণ করতে চেয়েছে। 'মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, লায়লা। এখানে আপনার আসাই উচিত হয়নি। নির্ধাত আপনার ওপর নজর রেখেছে ওরা। নাসের, চলুন!'

'লায়লা আমাদের সঙ্গে যাবে,' ভারী গলায় বলল নাসের।

লায়লা মাথা নাড়ল। 'নাসের, বোকামি কোরো না। তোমরা যাও।'

'না।'

ঘুরে হাঁটা ধরল হাসান, হাত দুটো পকেটে, দৌড়বার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমিয়ে রেখেছে। ফার্মহিয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে সে। পিছন থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল-একজোড়া ভারী পদক্ষেপ, আরেক জোড়া লঘু। হঠাৎ দু'জোড়া পায়ের আওয়াজই থেমে গেল। হাসান হেঁটেই চলেছে, গতি আরও বাড়িয়ে দিল। মনে মনে ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে সে। বিলে লেখা ঠিকানাটা দেখেছে নাসের। তার মুখ থেকে সেটা জেনে নিতে ইসরায়েলিদের খুব বেশি সময় লাগবে না। গোটা ব্যাপারটা লগুভও হয়ে গেছে। এখন আর এই মিশন সফল হবার প্রায় কোন সম্ভাবনাই নেই।

শহরের বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল হাসান। সামনের দিক থেকে ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে ওনে রাস্তার পাশের ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। সৈন্য ভর্তি ট্রাকটা পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। কিন্তু নাসের আর লায়লা গা ঢাকা দেয়নি। ট্রাকটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাব থেকে নিচে নামল একজন অফিসার। তার হুঙ্কার শুনতে পেল হাসান, 'পেপারস!'

'কি ঘটতে যাচ্ছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে সায় দিল না মন। ঝোপের আড়াল থেকে না বেরিয়ে' দ্রুত ফার্মহিয়ার্ডের দিকে এগোল হাসান। দশ মিনিটের

মধ্যে পৌছে গেল সে। কি ঘটেছে রিপোর্ট করল রানাকে।

‘এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,’ বলল রানা। ‘লায়লা বা নাসের মুখ খুললে সবাই আমরা মারা পড়ব।’

খেতের ওপর দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটছে ওরা। নাহিদকে কাঁধে তুলে নিয়েছে শামিম। কারুরই ভাল ঘুম হয়নি, এলোমেলো পা ফেলছে। ফসল ভরা খেত, আড়াল পেতে কোন সমস্যা হচ্ছে না। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের নিচে শহরটা অন্ধকার, পিছনে পড়ে থাকল। খেত থেকে ওদেরকে মেঠো পথে তুলে আনল শাফি, তারপর নিচু একজোড়া রিজ পেরোল ওরা। কেফার ভিটকিন-এর দিক থেকে এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল ওরা। দীর্ঘ একটা পাথুরে গ্যালারি বেয়ে নিচে নামতে হলো। রে-র অপর দিকে ইসরায়েলি সৈন্যরা নড়াচড়া করছে। তারা কোন অ্যাকশন নিচ্ছে কিনা, নিলে কাদের বিরুদ্ধে, এখান থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। ওরা শুধু প্রার্থনা করতে পারে, নাসের আর লায়লা নিরাপদে আছে।

‘এখানে থামুন,’ বলল শাফি।

পাথুরে একটা গলিতে পৌছেছে ওরা, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সেটা। গলির শেষ মাথায় পানির বিস্তৃতি। অন্ধকারে, অদৃশ্য হয়ে গেল শাফি।

রানা বলল, ‘শামিম? রেকি?’

একটা নিচু পাঁচিলের আড়ালে নাহিদকে গুইয়ে দিল শামিম, হাতে ধরিয়ে দিল একটা উজি, তারপর সে-ও হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। ফলের একটা বাগান পেরিয়ে গ্রামে ঢুকল শামিম। প্রথমে একটা, তারপর একসঙ্গে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। এক বাড়ির জানালা খুলে বুড়ো এক লোক কাকে যেন অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিল। একটা ঢালের মাথায় উঠে সাগরের দেখা পেল শামিম। নিচে একটা জেটি দেখা যাচ্ছে, শেষ প্রান্তে কয়েকটা জেলে-নৌকা বাঁধা। অটল দাঁড়িয়ে আছে শামিম, আশপাশে কিছু না নড়লেও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

ধৈর্যে মেওয়া ফলে। জেটির গোড়ায় ছোট একটা শেড, সেটার সামনে দেশলাই জ্বালল কেউ-কাঠিটার আলোয় ইস্পাতের একটা হেলমেট উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দ্বিতীয় হেলমেটটা পরিষ্কার দেখা গেল না, শুধু কিনারার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল।

এখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কুকুরগুলোও থামছে না। একই পথে ফিরে এল শামিম। পাঁচিল উপকে তার জন্য অপেক্ষা করছিল ওরা।

‘পাহাড়ের ওদিকে পিলবক্স,’ বলল রানা। ‘হারবার কাভার করছে।’

‘জেটিতে দু’জন নেশ্টি,’ বলল শামিম। ‘এদিকে কোন পিলবক্স নেই।’

হাসান বলল, ‘গ্রামেও কোন সৈন্য নেই। জেটি থেকে গ্রামে ঢোকার পথে তিনটে বাড়ির পর মোবারককে পাওয়া যাবে।’

‘নাহিদকে তোলা,’ নির্দেশ দিল রানা।

গ্রামে ঢোকার পর কুকুরগুলো এবার ছুটে এল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে নরম সুয়ে

ওগুলোকে কাছে ডাকল শামিম, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চেষ্টা করল ওরা আসলে শত্রু নয়, বন্ধু। অদ্ভুত ব্যাপার, সবগুলো কুকুর একযোগে বোবা হয়ে গেল। নির্দিষ্ট বাড়ির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ও-ই দরজা খুলল, ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল শাফি আর হাসান। কিচেন টেবিলে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ মুখ তুলেই চমকে উঠল।

লোকটা রোগা-পাতলা, মাথায় টাক, নাকটা ভাঙা, দাঁতগুলো হলদেটে। বাম হাতে একটা চামচ, ডান হাতে এক টুকরো রুটি। কাঁচের বাটিতে তরল কিছু আছে, রুটি ডুবিয়ে খেতে যাচ্ছিল। হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। শাফি বলল, 'আমরা অ্যাডমিরাল আফলাতুনের বন্ধু। আপনি আহমেদ ইস্রাফিল মোবারক?'

কালো চোখ সরু হলো। বন্ধ হলো মুখ, রুটি চিবাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে শান্ত সুরে 'জিজ্ঞেস করল, 'টাকা এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা সংখ্যায় খুব বেশি। একজন কথা বলবেন। কাছেপিঠে সৈন্য আছে।'

'পিলবক্সে চারজন দু'জন জেটিতে,' বলল রানা। 'এই তো সব?'

মাথা ঝাঁকাল মোবারক। 'টহল পাটি না আসা পর্যন্ত, হ্যাঁ।' লোকটার শান্ত আচরণে ভরসা করান মত কিছু যেন আছে। স্টোভের পাশের একটা চেয়ারে নাহিদকে বসিয়ে দিল শামিম। নাহিদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। চেহারা নীলচে সাদা।

জানালার কাঁচে বৃষ্টির শব্দ ছাড়া ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসে টমেটো, রসুন, মরিচ আর মাংসের গন্ধ ভাসছে। ফ্রাইং প্যানে একটা ভাজা ডিম দেখা যাচ্ছে। 'আপনারা আমার মেহমান, যেখানে যা পান সব খেয়ে ফেলুন-শুধু যাবার সময় দয়া করে দামটা ধরে দেবেন।'

খেতে বসে কেউ তেমন কথা বলল না। রানা শাফির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনফরমেশন।'

শাফির প্রশ্ন শুনে মোবারক বলল, 'আমি গুরীব জেলে। টাকা না পেলে খাব কি?'

নিজের প্যাক খুলে ওয়াটারটাইট বক্সটা বের করল রানা। সেটা খুলে মোবারককে দেখাল। 'পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার। শুধু তথ্য নয়, ট্রান্সপোর্টও দরকার আমাদের।'

প্রোট মোবারকের চোখ জোড়া চকচক করছে। 'সব নয়, অর্ধেক টাকা নেব আমি।'

'তথ্য না দিলে একটা টাকাও পাবেন না। অর্ধেক কেন চাইছেন?'

'কারণ তথ্যগুলো আপনাদের জন্যে দুঃসংবাদ।'

'বলুন শুন।'

'কথাটা সত্যি-সাবমেরিনগুলো আমি দেখেছি,' বলল মোবারক। 'ওগুলো হেলাল জাললু নামে এক জায়গায় আছে।'

ইসরায়েলি উপকূলের ম্যাপটা স্মরণ করল রানা। প্রায় প্রতিটি বন্দরেই গেছে ও, বাকিগুলোর নাম শুনেছে। কিন্তু হেলাল জাললু নামে কোন বন্দরের নাম এই প্রথম শুনল। মোবারক ওদেরকে সম্ভবত মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে। 'কোথায় সেটা?'

‘এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে,’ বলল মোবারক, শুনে রানার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল বেড়ে গেল।

‘জায়গাটা আমি চিনি,’ ওর কানে ফিসফিস-করল শাফি।

রানা বলল, ‘আমাদের একটা ম্যাপ দরকার।’

পাঁচ

মোবারকের কিচেন টেবিলে বিছানো অ্যাডমিরাল্টি চার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা। উপকূল রেখায় সমতল সৈকতের প্রায় কোন চিহ্নই নেই, চড়াই-উৎরাইই বেশি, কিনারার নিচে জলমগ্ন গুহার সংখ্যাও কম নয়। হেলাল জাললুকে বে-র একটা বাহু ঘিরে রেখেছে, চার্টে সেটার নাম লেখা রয়েছে দায়ান দায়ান।

বে-তে ঢোকার মুখটা একশো গজের বেশি চওড়া হবে না, তবে ভেতরে পানির গোলাকার বিস্তৃতি দুই মাইল, গভীরতা কম-বেশি বিশ ফ্যাদম। বে থেকে জমিনের দিকটায় দায়ান দায়ান গ্রাম। পেনিনসুলার ভূগায় একটা প্রাচীন দুর্গ দেখা যাচ্ছে। দুর্গের নিচে কয়েক সারি বিল্ডিং।

‘ওই দুর্গ থেকে ইসরায়েলিরা মাত্র কিছু দিন ধরে হারবারে ঢোকার পথটার ওপর নজর রাখছে,’ ওদেরকে জানাল মোবারক। ‘ওদের সঙ্গে মেশিনগান আর মর্টার আছে। আরও আছে একটা ম্যাগাজিন, সুরক্ষিত। দুর্গটাকে আসলে অ্যামিউনিশন, মিসাইল আর টর্পেডোর গুদাম হিসেবেই ব্যবহার করছে ওরা। এছাড়াও,’ পেনিনসুলার সরু গলায় মোটা একটা আঙুল রাখল সে, ‘এখানে দীর্ঘ একটা প্যাঁচল আছে। পুরানো প্যাঁচল, তবে মেরামত করা হয়েছে। দায়ান দায়ান-এ ঢোকার এটাই একমাত্র পথ, কাজেই প্যাঁচল উপকাতে হবে। হারবার বাদে বাকি অংশে খাড়া পাহাড়। হারবারে পৌঁছবার আগে কাঁটাতারের বেড়াও পেরুতে হবে, সৈকতে মাইনও পোঁতা হয়েছে। প্যাঁচলের প্রান্ত থেকে পুরানো ফিশ ফ্যাক্টরি পর্যন্ত সম্ভাব্য সবরকম ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করা হয়েছে। হারবারে ইসরায়েলি জাহাজ আছে, ডক-কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে—একজোড়া মার্চেন্ট শিপ। ফিশ ফ্যাক্টরির জেটিতে কার্গোও খালাস করে। ওগুলো মার্চেন্ট শিপ হলেও ডেকে মেশিন গান ফিট করা আছে, হারবার কাভার করে।’

‘সাবমেরিনগুলো কোথায়?’

মোবারক ব্যাখ্যা করল। ফিশ ফ্যাক্টরিটা বিশাল, মালিক এক আমেরিকান কোটিপতি। চারটে জেটি, একটা ড্রাই ডক সহ অনেক বোট তৈরি করেছিল সে। কিন্তু পর্যাপ্ত মাছ না পাওয়ায় ফ্যাক্টরি ফেলে চলে গেছে। তবে বিল্ডিংগুলো রয়ে গেছে। ব্যাংকের লোন শোধ না করায় লোকটার কোম্পানির সঙ্গে কেস চলছে। সেই সুযোগটাই ব্যবহার করছে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনী। ফ্যাক্টরিতে তারা ইষ্ঠাৎ করে জাহাজ ও সাবমেরিন মেরামত শুরু করেছে। জেটি বা প্ল্যাটফর্মের ওপর প্রচুর ক্রেন আছে।

রানা আবার প্রশ্ন করল, ‘হঠাৎ ছোটখাট একটা গ্যারিসন গড়ে উঠেছে, এই তো? সব মিলিয়ে ওখানে কতজন সৈন্য থাকে?’

মোবারক জানাল, এরকম একটা সুরক্ষিত জায়গায় কেউ ঢুকতে পারে না, কাজেই সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন তথ্য তার কাছে নেই। তবে তার ধারণা হাজার দুয়ের কম হবে না, টেকনিশিয়ান সহ। তবে শুধু যে নৌ-বাহিনীর লোক আছে, তা নয়। পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে। নেতৃত্বে আছে খুব বড় কোন অফিসার, কালো ইউনিফর্ম পরা। নির্যাত একজন জেনারেলই হবেন। কিংবা একজন অ্যাডমিরাল।

‘নিজেদের দুটো জাহাজ থেকে সাপ্লাই পায় ওরা,’ বলল রানা। ‘কিন্তু পাওয়ার পায় কোথেকে?’

মোবারক ব্যাখ্যা করল। দুর্গের পিছনে ছোট্ট একটা লোকালয় আছে, ওখানেই হারবারের লোকজন বসবাস করে। ব্যারাক আর দুর্গের মাঝখানে একটা বিল্ডিং আছে, ইসরায়েলিরা সেখানে অনেকগুলো ডিজেল এঞ্জিন আর জেনারেটর বসিয়েছে। বিল্ডিংটা সারাক্ষণ পাহারা দেয়া হয়। ওদিকের একটা গুহার ভেতর মেশিন গান আর মর্টারও আছে।

চেয়ারে বসে চোখ বুজে ছিল শামিম, কথা বলে ওঠায় বোঝা গেল ঘুমায়নি। ‘আপনি জায়গাটা সম্পর্কে সব কথাই দেখছি জানেন, মোবারক। কিভাবে?’

‘হেলাল জাললুতে মাছ ধরতে যায় আমার বন্ধুরা, তারাই এ-সব তথ্য দিয়েছে আমাকে।’

‘হেলাল জাললুতে এখনও মাছ ধরা হয়? ইসরায়েলি সৈন্যরা জেলেদের বাধা দেয় না?’

‘হাজার বছর ধরে মাছ ধরছে, এটাই তাদের পেশা,’ বলল মোবারক। ‘নিষেধ করলে কয়েকশো পরিবার না খেতে পেয়ে মারা পড়বে।’ সে আরও জানাল, হারবার থেকে শহর পর্যন্ত একটা রেলপথও আছে। হারবারে বিভিন্ন দেশের জাহাজ ভিড়ত, কাস্টমসকে ঘুষ দিলে যে-কোন পণ্য খালাস করা সম্ভব ছিল। অবশ্য ইসরায়েলি সৈন্যরা গ্যারিসন তৈরি করার পর বিদেশী জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

এতক্ষণে মুখ খুলল শাফি, ‘কথাটা সত্যি।’

‘তুমি জায়গাটা চেনো?’ আবার চোখ খুলল শামিম।

‘বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকতে হলে স্নাগলার হতে হয়, কাস্টমসকে ঘুষ দিতে জানতে হয়,’ জবাব দিল শাফি। ‘ওখানে আমার বন্ধু আছে। তবে সাবমেরিনগুলো আমি দেখিনি।’

‘ছিল,’ বলল মোবারক।

‘মানে?’ সিধে হয়ে গেল শাফির শিরদাঁড়া।

‘আকমল হাবিবের কথা বলছি,’ বলল মোবারক। ‘এ-সব তথ্য তার কাছ থেকেই পেয়েছি আমি, মাস দুই আগে।’

শাফি বলল, ‘তার সঙ্গে আমার চার মাস আগে দেখা হয়েছে।’ শামিমের দিকে তাকাল সে। বেঈমানী করা হচ্ছে বুঝতে পারলে শামিম তাকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে চায় না শামিম সন্দেহ করুক কোন তথ্য গোপন করা হচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'এ-সব তথ্য আমাদের খুব কাজে লাগবে।'

শাফির পেশীতে ঢিল পড়ল।

মোবারক বলল, 'আকমল হাবিবকে দায়ান দায়ান গ্রামে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলিদের হাতে ধরা পড়ে যায় বেচারী। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে গ্রামের একটা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তার লাশ। কাক-শকুন খেয়ে ফেলেছে, এখন শুধু কঙ্কালটা দেখতে পাবেন।' একটু থেমে গলা খাদে নামাল সে। 'যে খেলাটা আপনারা খেলতে যাচ্ছেন, সেটা ভয়ঙ্কর।'

'যুদ্ধ করতে এসেছি, ভয় দেখাচ্ছেন কেন?' কটমট করে তাকাল শামিম।

কিচেনে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'সাগরে ইসরায়েলিদের ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে কি জানেন?'

'সাগরে তেমন কোন ডিফেন্স ফ্যাসিলিটি নেই,' বলল মোবারক। 'জেটির চারপাশে অ্যান্টি-সাবমেরিন নেট আছে। নেট-এর পর পাহাড়-প্রাচীর, আশি মিটার উঁচু। পাহাড়-প্রাচীরের নিচে সাগর। পানিতে প্রবল আলোড়ন, সাদা ফেনা ছাড়া কিছুই দেখার নেই। মাস চারেক আগে মাছের আড়তদার পারভেজের বোট পাহাড়-প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেছে, পাঁচিলের নিচে। ত্রু সহ ডুবে গেছে আড়তদার। বিশাল নৌকাটা নাকি এখনও আছে ওখানে, মানে যতটুকু থাকা সম্ভব আর কি। ভাটার সময় নাকি দেখা যায়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আর কিছু জানার নেই আমাদের। আপনার বোটটা কোথায়?'

'স্যার?'

'ওটা আমাদের দরকার।'

আড়চোখে রানার হাতের দিকে তাকাল মোবারক। চ্যাপ্টা টিনের বাক্সে নগদ মার্কিন ডলার আছে।

রানা বলল, 'আমরা ল্যান্ড করার পর টাকা পাবেন, তার আগে নয়। রাজি?'

এই লোকের সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না, বুঝল মোবারক। 'ঠিক আছে। রাজি।'

'কখন আমরা রওনা হব?'

'চারটের সময় হারবারে পানি থাকবে,' বলল মোবারক। 'ওই সময় সেক্সিরা খুব একটা সতর্ক থাকে না, বেশিরভাগই ঘুমায়। আপনারা জেটির কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবেন। বোটে ওঠার সময় হলে পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে আলো জ্বালব আমি।'

'ইসরায়েলি সৈন্যরা চ্যালেঞ্জ করলে?' জানতে চাইল শামিম।

'আমি একজন জেলে, আমার বোট ওরা চেনে,' বলল মোবারক। 'বোটে ইসরায়েলি পতাকা উড়বে। আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন টাইপের ড্রেস আছে, আমি ধরে নিচ্ছি। কিন্তু বোটে ওঠার পর জেলেদের কাপড় পরতে হবে। সে-সব আমি যোগাড় করে রাখব।'

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, কেফার ভিটকিনের দিক থেকে গোলাগুলির

আওয়াজ ভেসে এল, তারপরই শোনা গেল গ্রেনেড বিস্ফোরণের কয়েকটা শব্দ চেয়ারে হেলান দিয়ে বৃষ্টির আওয়াজ শুনছে ও। ঘুম তাড়াবার জন্যে কফি খাচ্ছে কিন্তু চোখ দুটো আপনাআপনি বুজে এল। হাসান আর শাফি এরইমধ্যে নাক ডাকতে শুরু করেছে। নাহিদ চূপচাপ ঝুটে, কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড় ঘড় শব্দ বের হচ্ছে বন্ধুকে বাঁচানো সম্ভব নয়, উপলব্ধি করে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার

খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল অন্ধকারে। মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে, মুখের ভেতরটা বিষাদ লাগছে, মাথায় ব্যথা। অন্ধকারে কথা বলে উঠল কেউ, পাশ থেকে গলাটা শামিমের। 'বাইরে লোকজন, মাসুদ ভাই।'

দরজায় নক হলো। বাইরে থেকে নাসেরের গলা ভেসে এল, 'ইব্রাহিম! আফলাতুন!'

দরজা খুলে দিয়ে মোবারক বলল, 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকল নাসের, সঙ্গে লায়লা। ল্যান্সের ম্লান, হলদেটে আলোয় চারদিকে তাকাল ওরা, কাউকেই পরিষ্কার চিনতে পারল না। 'মেজর রানা, আমি নাসের

'খুশি হলাম,' ম্লান সুরে বলল রানা।

কিচেনে নিশ্চরতা নেমে এল।

নাসের আবার বলল, 'হাসান সব বলেছে, আশা করি। লায়লাকে ওরা ছেড়ে দেয়। পথে ইসরায়েলি সৈন্যরা আমাদেরকে থামিয়েছিল। কাগজ-পত্র দেখে আটকায়নি। গ্রামের মাথায় একটা গোলাঘরে লুকিয়ে ছিলাম আমরা। পাহারায় ছিলাম, ওখান থেকে রোডটা দেখা যায়। কেউ এদিকে আসেনি। ইসরায়েলিরা আমাদেরকে হারিয়ে ফেলেছে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে রানা বলল, 'এখান থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনছি আমরা।'

'গোল্ডফিশ কাফেতে গৌফঅলা কমান্ড্যান্ট-এর কথা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল নাসের। 'সে হিযবুল্লাহ মিলিশিয়ার লীডার, সঙ্গে সত্তরজন লোক আছে কমান্ড্যান্ট আমাকে কথা দিয়েছে, ইসরায়েলিদের তারা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। মোবারককে বলল, 'বোটটা আনার ব্যবস্থা করুন। কতক্ষণ লাগবে?'

'সৈকতে পৌঁছতে? আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছতে পারি।' নোংরা ওয়েস্ট কোর্ট থেকে পকেট-ঘড়ি বের করল মোবারক। 'তবে সাড়ে চারটের দিকে পৌঁছব মনে রাখবেন, সেন্ত্রিদের চোখে ঘুম থাকলেও, প্রতি ঘণ্টায় ফিল্ড টেলিফোনে রিপোর্ট পাঠায় ওরা। কাজেই খুব সাবধানে যাবেন।' পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে

হাতঘড়ি দেখল রানা, আড়াইটা বাজে। 'নাহিদকে জাগাও এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।'

নাসের জানতে চাইল, 'কমান্ড্যান্টকে নিয়ে কি করা হবে?'

'মানে?'

'সত্তরজন মিলিশিয়াকে নিয়ে ভোরের আগেই এখানে পৌঁছবে।'

'লোকটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে,' বলল লায়লা।

‘মাতাল হোক বা না হোক, তাকে আমি চিনি। বলেছে যখন, সময়মতই পৌঁছুবে,’ বলল নাসের।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল নাহিদ। মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। ইঠাৎ তার হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। ‘রানা ভাই, সেক্ষেত্রে একজনকে পাহারায় রেখে যেতে হবে তোমাদের।’

কথা না বলে নাহিদের হাতে ধরা রিভলভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

নাসের বলল, ‘কমান্ড্যান্ট নিজের লোকদের নেতৃত্বে থাকতে চাইবে, আপনার নেতৃত্ব সে মানবে না।’

‘কে নেতৃত্ব দেবে সেটা প্রসঙ্গ নয়,’ রানার দিকে তাকিয়ে কপ্পা বলছে নাহিদ। ‘আমি আমার লীডারের কাছে পিছনে থেকে যাবার অনুমতি চাইছি।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘নাহিদ, এ সম্ভব নয়।’ চেয়ার ছেড়ে দাড়াইল ও, এক পা সামনে এগোল। হাত পাতল। ‘রিভলভারটা দাও, নাহিদ, প্লীজ।’

‘না,’ ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে নাহিদের ঠোঁটে, সারা মুখ ব্যথায় কাতর। ‘না, মাসুদ ভাই, আমার সময় শেষ। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। তোমরা যদি জোর করে নিয়ে যেতে চাও, সময়ের খানিক আগে মরতে হবে আমাকে—নিজের হাতে।’

পিছিয়ে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রানা। নাহিদকে চেনে; জানে, মুখে যা বলছে কাজেও তাই করবে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড। নাহিদকে ফেলে যেতে হবে, এই চিন্তাটাই অসুস্থ করে তুলছে ওকে। তবে এ-ও সত্যি যে নাহিদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। তাকে অপারেশনের এই শেষ পর্যায়ে সঙ্গে রাখা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হবে ওরা।

নাহিদ আবার মুখ খুলল। ‘সহজ যুক্তি, মাসুদ ভাই। বোটে চড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, কাকে তোমরা সঙ্গে নিতে চাইছ? আমার মৃত্যু তো সময়ের ব্যাপার মাত্র।’

‘কিছু,’ নাসের বলল, ‘আপনি মোবারকের বাড়িতে থাকতে পারবেন না। সৈন্যরা এটাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।’

‘যে গোলাঘরটায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেটা নাহিদের বিশ্রাম নেয়ার জন্যে আদর্শ জায়গা,’ মুখ থেকে হাত নামিয়ে বলল রানা। ‘ওখান থেকে রোড, হারবার দেখা যায়—কমান্ড পোস্ট হিসেবেও মন্দ নয়। হাসান, নাহিদকে একটা উজি দাও। নাহিদ, কমান্ড্যান্টকে আমরা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।’ চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল ও, বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। ‘মিশন সফল হোক বা না হোক, আমাদের একজনও যদি বেঁচে থাকে, তোমাকে সে নিতে আসবে।’

‘আমার মা আর বউ, ওদেরকে জানিয়ে, মাসুদ ভাই,’ বিড়বিড় করল নাহিদ।

কথা বলতে গিয়ে পারল না রানা। দু’তিনবার কাশতে হলো। ‘হ্যাঁ, অবশ্যই—বলব, তোমার সাহায্য ছাড়া এতদূর আমরা আসতে পারতাম না।’

জোর করে নিঃশব্দে হাসল নাহিদ। ‘বাড়িয়ে বলার স্বভাবটা তোমার গেল না দেখছি!’

হাসানের দিকে তাকাল রানা। ‘নাহিদকে গোলাঘরে রেখে আসার ব্যবস্থা

করো।’

নাহিদকে নিয়ে চলে গেল হাসান। যাবার আগে সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল নাহিদ।

শামিম বলল, ‘এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। ওর সাহসের কোন তুলনা হয় না।’

চুপচাপ সব দেখছিল লায়লা, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এসেছে। শামিমের কথা শেষ হতে নীরবে মাথা ঝাঁকাল। ভেজা চোখ লুকাবার জন্যে ওদের দিকে পিছন ফিরল রানা।

এক মিনিট পর নজর রাখার জন্যে লায়লাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল নাসের। তারপর রানার পাশে এসে বলল, ‘লায়লাও আমাদের সঙ্গে বোটে থাকছে।’

‘কেন?’

‘ওকে রেখে গেলে মুখ খুলতে পারে,’ বলল নাসের। ‘মাছ ধরার নৌকায় মেয়েরা প্রায়ই থাকে, সৈন্যরা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে।’

রানা ভাবল, লায়লা নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। শুধু এই মেয়েটার কারণেই না অপারেশনটা ভেস্তে যায়। লায়লা অবশ্য জানে না বোট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা, কেনই বা যাচ্ছে। কিন্তু ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর হাতে আরেকবার ধরা পড়লে, তারা ওকে কথা বলাবেই। লায়লা সব কথা না জানলেও, অনেক কথাই জানে। মুখ খুললে সর্বনাশের আর বাকি থাকবে না কিছু।

অবশ্য এরইমধ্যে যদি মুখ খুলে না থাকে। ‘ঠিক আছে, আপনার স্ত্রীকে ডাকুন,’ বলল রানা।

চারটে বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে মোবারকের বাড়িতে ফিরে এল হাসান। নাহিদকে দুই কিলো জেলিগনাইট, ছ’টা গ্রেনেড, উজ্জি, রিভলভার আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি দিয়ে এসেছে সে।

কিচেন টেবিলে নোংরা একটা গ্লাস আর একটা প্লেট ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, টেবিল বা অন্য কোথাও এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যাবে এখানে সাতজন পুরুষ আর একটা মেয়ে রাত কাটিয়েছে। পিঠে প্যাক, হাতে উজ্জি, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে রানা। হাসান বাস্কেটলো কাঁধে তুলল। শান্তি মিশনের সদস্যরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, বাগানের দেয়াল উপকে সমতল পাহাড় চূড়া অর্থাৎ খোলা খেত ধরে এগোচ্ছে। এই চূড়ার কিনারা থেকে সেন্দ্ৰিদের ওপর নজর রাখছে শামিম। বাতাসের গতি কমে গেছে। বে-র পানি প্রায় নিস্তরঙ্গ। জেটির কাছে কয়েকটা ফিশিং বোট ছিল, একটা অদৃশ্য হয়েছে। বে-র চারপাশ হালকা কুয়াশায় ঢাকা, ডিজেল এঞ্জিনের শব্দ শুনে বোঝা গেল, জেলেরা রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এখন শুধু জোয়ার আসার অপেক্ষা। সেন্দ্ৰিদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না জেটির আশপাশে।

শামিমের সঙ্গে কথা বলল রানা, ‘সেন্দ্ৰিরা তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে রেডিওতে অল-ক্রিয়ার মেসেজ পাঠাবে হেডকোয়ার্টারে। ওরা মেসেজ পাঠাবার পর অ্যাকশনে যাব আমরা। কেটে পড়ার জন্যে সময় পাব আধ ঘণ্টা।’

‘আপ ঘন্টা?’ পাশ থেকে অচেনা এক লোক বলল, অন্ধকারে তাকে দেখতে না পেলেও সস্তা মদের গন্ধ পেল রানা। ‘স্যার, আমি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আপনাদের আমরা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় পাইয়ে দেব।’

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা।

‘মেজর রানা,’ বলল লোকটা। ‘আপনার সম্পর্কে শুনেছি। আমি কমান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ, আপনার হুকুম তামিল করার জন্যে প্রস্তুত।’

‘এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম,’ রানাকে বলল নাসের। ‘সাবেক হিবুল্লাহ কমান্ড্যান্ট...’

রানা শুধু উদ্ভিগ্ন নয়, বিরক্তও বোধ করল। অধিক সন্ধ্যাসীতে গাজন নষ্ট বলে একটা কথা আছে। নাসেরকে থামিয়ে দিয়ে কঠিন সুরে মধ্যবয়স্ক কমান্ড্যান্টকে নির্দেশ দিল, ‘আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা, কমান্ড্যান্ট আপনি সময়মতই পৌছেছেন। কিন্তু যদি সাহায্য করতে চান, দলবল নিয়ে মেজর নাহিদের নেতৃত্বে কাজ করতে হবে আপনাকে। গ্রামের ওপর গোলাঘরে রিয়ারগার্ড হেডকোয়ার্টার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে গিয়ে মেজর নাহিদের কাছ থেকে নির্দেশ নিন। ভাল কথা, আপনার লোকদের বলে দিন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, এবং কোন রকম আওয়াজ করা চলবে না।’

কমান্ড্যান্ট পাথর হয়ে গেল। নিচে, ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে, জেটির পাশে একজন ইসরায়েলি সৈন্যকে ধীর পায়ে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে। অপর সৈনিক নিশ্চয়ই ফিল্ড টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবে। কমান্ড্যান্ট বলল, ‘রিয়ারগার্ড অ্যাকশন? আহত একজন মেজরের অধীনে? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি...’

‘এই, এই, সাবধান!’ চাপা গলায় বলল হাসান। ‘সরে এসো ওখান থেকে!’ তুপ করা ইকুইপমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গাড় কয়েকটা ছায়ামূর্তি। ‘তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি...’

কথা শেষ হলো না, হাসানের মাথার পাশে কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। রাইফেলের গুলি, বুঝতে দু’তিন সেকেন্ড সময় লেগে গেল তার। কমান্ড্যান্টের গর্বিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, ‘আমরা হিবুল্লাহ মিলিশিয়া, কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী।’ জেটির দিকে আবার গুলি করল সে।

ইসরায়েলি সেন্ত্রির কাছ থেকে তিন ফুট দূরে লেগেছে বুলেট, চোখের পলকে ডাইভ দিয়ে সরে গেছে সে আড়ালে। দ্বিতীয় বুলেটটা খালি জেটিতে কোথাও লাগল।

ইতিমধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়েছে রানা। রাগে পিণ্ডি জ্বলছে, তবে এখন আর কিছু করার নেই—ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে নাহিদ, তুমি একা হয়ে গেলে, ভাই—ভাবল ও। হাসান আর শামিম অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, যেমনটি আশা করেছিল। ডাকল, ‘শামিম?’

‘পিল বরু আমার দায়িত্বে,’ অন্ধকার থেকে শামিমের গলা ভেসে এল।

‘শুভ হাসান?’

‘আমি সেন্ত্রিদের ব্যবস্থা করব,’ জবাব দিল হাসান।

হাতঘড়ি দেখল রানা। তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সন্দেহ নেই, রেডিওতে চিৎকার করছে সেন্টি-রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাও, আমরা আক্রান্ত হয়েছি!

নিশ্চিন্ততা এমন ভৌতিক আর অটুট, কল্পনা করা কঠিন যে এইমাত্র গোঁয়ার আর গর্দভ একজন সাবেক হিযবুল্লাহ কমান্ড্যান্ট শান্তি মিশনের অপারেশন ব্যর্থ করার জন্যে যে কাজটি করা দরকার ঠিক সেটাই করে বসেছে। তারপর, উপত্যকার পাশের দ্বিতীয় পাহাড় চূড়ায়, গ্রামের মাথায়, ঝলসে উঠল আগুন। পিলবক্সের ইসরায়েলিরা অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে।

মেশিনগানের আওয়াজ ভেসে এল কয়েক সেকেন্ড পর, হেভি-ক্যালিবার বুলেট ছুঁড়ে ওরা। ঝাঁকি খেয়ে কমান্ড্যান্টের এক লোক পড়ে গেল, বাকি সবাই ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ল, তাদের বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক। 'হায় আল্লাহ! কি ঘটল?' জানতে চাইল কমান্ড্যান্ট।

লায়লার পাশে শুয়ে আছে নাসের, স্ত্রীর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। 'শালা বুড়ো!' এত রেগে গেছে, ইচ্ছে থাকলেও আর কোন গাল দিতে পারল না।

শাফি দমকা বাতাস অনুভব করল, পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। একটু পর বুঝতে পারল বাতাস নয়, কারণ বাতাস কথা বলে না। 'পাঁচ মিনিট পর নেমে এসো,' রানার গলা। 'ইকুইপমেন্ট নিয়ে।'

দুলকি চালে দৌড়ে গ্রামটা পেরিয়ে ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে শামিম, বেশি পরিশ্রম করে হাঁপিয়ে উঠতে রাজি নয়। পিলবক্সটা এই মুহূর্তে সরাসরি তার মাথার ওপর, দৃষ্টিপথের ওপর দিয়ে সারি সারি ছুটে যাচ্ছে ট্রেসারগুলো। রাত হবার আগেই পিলবক্সটা দেখে নিয়েছে সে, শ্রেফ একটা কংক্রিট বক্স, দরজাটা ইম্পাতের, গায়ে একটা ফাটল আছে, সেই ফাটল দিয়ে মেশিন গানের ব্যারেলই শুধু বেরুতে পারে বাইরে-সৈকত আর বে কাভার করার জন্যে যথেষ্ট।

সাগরে কি যেন একটা নড়ছে। সম্ভবত একটা ফিশিং বোট। কাঠামোটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করল শামিম। আশপাশে কোথাও সেন্টি না থেকে পারে না। মাটিতে শুয়ে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে এক লোক, নড়াচড়া দেখে নার্ভাস বলে মনে হলো, উল্টোদিকের পাহাড়চূড়া লক্ষ্য করে ছোড়া বুলেটের আওয়াজে প্রতিবার কঁপে উঠছে। তাকিয়েও আছে সেদিকে, অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই।

পিছন থেকে প্রথমে তার গলা চেপে ধরল শামিম, তারপর ছুরিটা বুকে ঢুকিয়ে দিল। ধীরে ধীরে লাশটা মেঝেতে নামাল শামিম, হেলমেট খুলে নিজের মাথায় পরল। ধীর পায়ে হেঁটে পিলবক্সের দরজার দিকে এগোল সে। পকেট থেকে গ্রেনেড বের করল, প্রকাণ্ড হাতে কালো কয়েকটা ডিম। বাম হাতে দুটো রাখল, লিভার খোলা হয়নি। তৃতীয়টা থাকল ডান হাতে। এক পশলা গুলিবর্ষণ শেষ হবার অপেক্ষায় থাকল সে। তারপর গ্রেনেড ঠুকল ইম্পাতের দরজায়। 'ওহে,' চিৎকার করে হিষ্কাতে বলল, 'তোমাদের বানচোত সেন্টি কোথায় মরতে গেছে?'

পিলবক্সের ভেতর থেকে ভোঁতা গুঞ্জন ভেসে এল।

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, মেজর সিমন বারেক!' গর্জে উঠল শামিম। 'দিস ইজ

অ্যান এক্সারসাইজ! ওপেন আপ!

ইস্পাতের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটা তারা জ্বলা আকাশের গায়ে হেলমেট পরা কাঠামোটাই শুধু দেখতে পেল, চেহারাটা অন্ধকারে ঢাকা। 'ইয়েস, স্যার?' বেরিয়ে এল সে।

লাথি মেরে আবার ভিতরে পাঠিয়ে দিল তাকে শামিম, পিন খোলা দুটো ধ্রেনেড অনুসরণ করল। পিলবক্স যখন বিস্ফারিত হলো, দরজা লাগিয়ে দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ততক্ষণে পঞ্চাশ ফুট নিচে নেমে গেছে সে।

ছয়

সৈকতে সেন্দি রাখা হয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে, বিশেষ করে স্বাগলারদের ওপর নজর রাখার জন্যে। সশস্ত্র হামলা ঠেকাবার কথা কখনোই ভাবেনি তারা, সময় কাটে ঘুমের ঢাকা শুনে। হাসানকে নিয়ে রানা যখন জেটিতে পৌঁছল, সেন্দিরা গার্ড পোস্টে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, উচ্চকণ্ঠে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, টেলিফোনে চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

রানা আশা করছে, মোবারক যেন দেরি করে না ফেলে। পাঁচ মাইলের মধ্যে প্রচুর ইসরায়েলি সৈন্য আছে, কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই তারা পৌঁছে যাবে।

লাথি মেরে কাঠের দরজাটা খুলে ফেলল রানা। হাতে টেলিফোনের রিসিভার, একজন সেন্দি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দু'জনেই মোটাসোটা, কারুরই বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একজনও ওদের দিকে রাইফেল তুলল না। প্রায় যন্ত্রচালিতের মত একযোগে হাত তুলল মাথার ওপর।

'চাবি,' বলল রানা।

একজন সেন্দি পকেট থেকে চাবি বের করে রানার হাতে গুঁজে দিল।

'রাইফেল ফেলে দাও,' নির্দেশ দিল রানা। পাথুরে মেঝেতে ধাতব আওয়াজ তুলল একজোড়া রাইফেল। ওগুলো তুলল ও, একটা হাসানের হাতে ধরিয়ে দিল, অপরটা উল্টো করে টেলিফোন সেটটায় কয়েকটা বাড়ি মারল। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল হাসান।

'কথাগুলো মন দিয়ে শোনো,' সেন্দিদের বলল রানা। 'এটা একটা ইরাকী হিবুব্লাহ জয়েন্ট অপারেশন। ইরানী-হিবুব্লাহ মিলিশিয়া, মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইসরায়েলি সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ওরা কেউ আমাদেরকে সাহায্য করেনি, তাই আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়ে গেছে। একটা সাবমেরিন আমাদেরকে তুলে নিতে এসেছে, আমরা চলে যাচ্ছি। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল সেন্দিরা।

'তোমরা তোমাদের কমান্ডিং অফিসারকে তথ্যগুলো জানাবে,' আবার বলল রানা। 'আমরা, ইরাকীরা, একটা কমান্ডো অপারেশনে এসেছিলাম, কিন্তু কারও কোন সহযোগিতা না পাওয়ায় টার্গেট খুঁজে পাইনি। অফিসারকে জানাবে, আবার

আমরা ফিরে আসব—অদূর ভবিষ্যতে। সেবার সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে আসব, কাজেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে না।’

প্রয়োজন নেই, তবু ঘন ঘন মাথা ঝাঁকানো সেন্দ্রিরা।

বাইরে বেরিয়ে এল রানা ও হাসান। দরজায় তাল লাগাল রানা। কান পাততে হলো না, ট্রাক বহরের আওয়াজ ভেসে এল বাতাসে। রিইনফোর্সমেন্ট পৌছে গেছে।

ঢাল বেয়ে জেটিতে নেমে এল নাসের, সঙ্গে রয়েছে শাফি আর লায়লা। প্যাক আর বাস্তুগুলো নিয়ে আসতে ভোলেনি ওরা। ফিরে এসেছে শামিমও। দিগন্তরেখার কাছ থেকে সৈকতের দিকে ছুটে আসছে একটা ফিশিং বোট, আকাশের গায়ে মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। শাফিকে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার শালা, মানে বুড়ো গাধাটা কোথায়?’

‘সৈন্যদের ঠেকাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

‘যাও, তাকে গিয়ে সাবধান করো—ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করলে তাকে খুন করার জন্যে কমান্ডো পাঠাব আমি। ভুলটা ভেঙে দিয়ো, বলবে আমরা ইরাকী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। আরও বলবে, সাবমেরিনে চড়ে ফিরে যাচ্ছি আমরা। সেন্দ্রিদেরও তাই বলা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। যাও!’

শাফি অন্ধকারে হারিয়ে গেল। নাসের ফৌস ফৌস করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ‘ও আল্লাহ, ফিশিং বোট এখনও আসছে না কেন!’

‘আমি কি সাগর, আমার দিকে তাকিয়ে বোট খুঁজছেন?’

সাগরের দিকে তাকাতেই জেটির শেষ প্রান্তে বোটটাকে দেখতে পেল নাসের। লায়লার নিরাপত্তা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত সে, মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে না। বলল, ‘এখন যদি ট্রাক ভর্তি ইসরায়েলি সৈন্য সৈকতে নেমে আসে, বোটটা ডুবিয়ে দেবে।’

হ্যাঁ, ভাবল রানা। শুধু বোট ডোবাবে? তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। নাহিদের কথা মনে পড়ে গেল। গুডলাক, দোস্ত। বেঁচে থাকলে তো কথাই নেই, প্রার্থনা করি মৃত্যুর পর হলেও যেন দেখা হয় আবার।

ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, ওগুলো গ্রামের শেষ মাথায় পৌছে গেছে।

জেটি ধরে ছুটে আসছে এক লোক। মোবারক। ‘আসুন, স্যার! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! বোটে উঠুন!’

ফিরে এল শাফি, অন্ধকারে হাঁপাচ্ছে। ‘বলেছি।’ জেটি ধরে ছুটল সে, বাকি সবাই তার সামনে। বোটের প্রপেলার পানিতে আলোড়ন তুলছে। আকাশে মেঘ না থাকারই মত, বেশ অনেকগুলো তারা দেখা যাচ্ছে। তারা আর সাগরের মাঝখানে উঁচু হয়ে রয়েছে বোটের বো। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে থাকল গোটা পরিবেশ। পরমুহূর্তে গোটা উপত্যকাটাই যেন আগ্নেয়গিরির মত বিস্ফারিত হলো।

জেলিগনাইটে টাইম পেন্সিল ঢুকিয়ে গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এল যেন মুমূর্ষু এক পশু। বাক নিয়ে হেডলাইটের আলো এখনও রাস্তায় পড়েনি, কখনও শরীরটাকে

গড়িয়ে দিয়ে, কখনও মাটিতে নিতম্ব ঘষে এগোচ্ছে নাহিদ-রাইফেল, রিভলভার, গ্রেনেড আর জেলিগনাইটের বোঝা চুষকের মত পিছন দিকে টানছে যেন। রাস্তার মাঝখানে গর্তের ভেতর জেলিগনাইট রেখে পাশের ঝোপে লুকিয়ে থাকল, হাতে গ্রেনেড, পাশে রাইফেল ও রিভলভার।

একে একে বাঁক ঘুরল তিনটে ট্রাক, একটার পিছনে আরেকটা। প্রতিটি ট্রাকে তিল ধারণের জায়গা নেই, গিজ গিজ করছে রাইফেলধারী সৈন্য, প্রতিটি ক্যাবের মাথায় মেশিন গান ফিট করা।

প্রথম ট্রাক পার হয়ে গেল, জেলিগনাইট ফাটল না। পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল নাহিদ। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, দুর্বল হাতে ছোঁড়া গ্রেনেড ট্রাক থেকে বেশ খানিক দূরে পড়ল। দ্বিতীয় ট্রাক জেলিগনাইটের ওপর চলে এল। আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল নাহিদ। তারপর কি হলো, দেখার জন্যে নাহিদ বেঁচে নেই। প্রথম গ্রেনেড আর জেলিগনাইট একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। রাস্তা, পাশের জঙ্গল, দু'পাশের ঘর-বাড়ি, তিনটে ট্রাক, নাহিদ, এমনকি আকাশের কয়েকটা বাদুড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আশপাশের এলাকা, গোটা উপত্যকা, এমন কাঁপতে শুরু করল, যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। বিরাট জায়গা জুড়ে তৈরি হলো অগ্নিকুণ্ড, শিখাগুলো আকাশ ছুঁতে চাইছে।

শেষ আরও একটা ট্রাক পিছিয়ে পড়েছিল, বাঁক ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা। একশো গজ দূর থেকে আগুনের আঁচ লাগছে গায়ে। একজন মেজরের নেতৃত্বে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সৈন্যরা, উজি আর রাইফেল নিয়ে ছুটল তারা আরেক দিকে, ঘুরপথে সৈকতে পৌঁছুবে।

শক ওয়েভের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো মোবারকের বোট আলবিদা। হুইলহাউসে রয়েছে সে, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে দেখার জন্যে কাউকে পাঠাবেন নাকি?'

কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। নাহিদের প্রতি কৃতজ্ঞায় মাথাটা নত হয়ে আছে, যেন ধ্যানে বা প্রার্থনায় মগ্ন।

রানার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মোবারক অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'স্যার, আমার টাকাটা এবার পেতে পারি...'

সৈকত থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হতে থেমে গেল সে।

সাগরের পানি অন্ধকারে কালো আর মসৃণ ছিল, শেষ ট্রাকের সৈন্যরা মেশিনগান থেকে ফায়ার শুরু করায় পানির সারফেস টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। এক পশলা বুলেট ঢুকল হুইলহাউসে। আওয়াজ শুনে মনে হলো মোবারক হেসে উঠল, 'হে-হে, টাকা...উফ!' হুস করে শব্দ হলো নাক থেকে, যেন ফুসফুস খালি করতে চাইছে। কয়লা ভর্তি বস্তার মত হুইলহাউসের ডেকে পড়ে গেল সে। হাঁটু গেড়ে তার পালস পরীক্ষা করল রানা। নেই। মারা গেছে।

মুখ তুলে বাইরে তাকাল রানা। ভোর হয়ে আসছে। হাসানকে দেখতে পাচ্ছে, ডেকে মাথা নিচু করে বসে আছে, হাড়সর্বশ্ব হাঁটু জোড়া কানের পাশে। মোবারককে ডিঙিয়ে এসে হুইলটা ধরল রানা, চার্টে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল কোন দিকে যেতে হবে। পশ্চিম দিকে রওনা হলো আলবিদা।

দিগন্তরেখার ওপর দুর্গ-প্রাকারের মত কুয়াশার পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় রক্তরঙা সূর্য উকি দিল।

শামিম খুব কম কথা বলে, হঠাৎ রানার পাশ থেকে যেন আপনমনেই বিড়বিড় করল, 'মাসুদ ভাই, নাহিদ মারা যাওয়ায় এই অপারেশনে আমাদের ব্যর্থ হওয়া চলবে না হয় আমরা জিতব, নাহয় খুন হয়ে যাব-নাহিদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানাবার অন্য কোন বিকল্প নেই।'

রানা বিম্বণ, কৃতজ্ঞতায় অধোবদন

তারপুলিনে মুড়ে মোবারকের লাশটা পানিতে ফেলে দেয়া হলো, সঙ্গে কিছু বাতিল লোহা ভরে। তার আগে জানাজা পড়েছে শাফি। নিঃশব্দে তলিয়ে গেল লাশটা।

খানিক পর আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করল, অদৃশ্য হলো সূর্য। গন্তব্যে পৌঁছতে বারো ঘণ্টা লাগবে ওদের।

আলবিদা পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা, সামনের দিকে উঁচু আর পিছন দিকে খাটো একটা মাস্তুল আছে। পাল তোলার আয়োজন থাকলেও, ব্যবহার করার দরকার পড়বে না বলেই ধারণা করল রানা। বোটের মাঝখানে বড় আকৃতির ফিশ-হোল্ড। সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ডিজেল এঞ্জিন। বুলেটে ঝাঁঝরা হুইলহাউসে একটা কমপাস থাকলেও সেটা কতটুকু নিখুঁত কাজ করছে বলা কঠিন। অ্যাডমিরাল্টি চার্টটা অনেকদিনের পুরানো, তাতে আবার কয়েক ঘণ্টা আগে রক্তের দাগ লেগেছে। ফাইভ নট স্পীডে এগোচ্ছে আলবিদা। শাফি সাবধান করে দিল, সামনে থেকে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর টহল বোট আসতে পারে।

একটা লকার খুলে ব্র্যান্ডির কয়েকটা বোতল পেল শামিম, আরও রয়েছে কয়েকটা দেশের ভাঁজ করা পতাকা। হলুদ একটা পতাকার ভাঁজ খুলে রানাকে দেখাল। 'কোয়ারানটিন', বলল সে। 'বোটে রোগ ছড়িয়ে পড়লে ওড়ানো হয়।' এই প্রথম দাঁত দেখা গেল, অর্থাৎ হাসছে সে। 'কিংবা চোরাই মাল থাকলে।'

'মোবারক বলেছিল, বোটে একটা তুর্কী পতাকা আছে।'

একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল সেটা বেশ বড় পতাকা। রানার নির্দেশে মাস্তুলে ওড়ানো হলো সেটা। আলবিদা এখন তুর্কী বোট। তুর্কীদের সঙ্গে ইসরায়েলিদের গলায় গলায় ভাব না থাকলেও, শত্রুতা নেই। দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে।

বাতাসের গতি বাড়ছে। সামনে কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। 'কফি?' জিজ্ঞেস করল হাসান

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সবার জন্যে বানাও।'

ধাপ বেয়ে গ্যালিতে নেমে গেল হাসান। খানিক পর রানা আর শামিমের জন্যে ধূমায়িত দু'কাপ কফি নিয়ে ফিরে এল। কফি খেয়ে শামিমকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে লম্বা একটা বেঞ্চে গুয়ে পড়ল রানা। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

হাসানকে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে গেল শাফি, জাল ফেলে মাছ ধরার অভিনয় করতে হবে।

চার ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল রানার। ইতিমধ্যে প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে। সাগর শান্ত, যদিও আকাশে মেঘ আরও বেড়েছে, বাতাসের গতিও খুব বেশি। ‘ঘুমিয়ে নাও,’ চার্ট আর কমপাস দেখে নিয়ে হাসানকে বলল রানা। ‘চার ঘণ্টা। ঘুম থেকে উঠে ইকুইপমেন্ট চেক করবে। তারপর আমি ব্রিফ করব।’

ফো'ক্যাসলে চলে এল হাসান। এখানে নিজের বাস্কে নাক ডাকাচ্ছে নাসের। নিচের বাস্কে লম্বা হলো সে।

চোখে বিনকিউলার, ইসরায়েলি গানবোট থেকে আলবিদার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন সিমন পেরেজ। আলবিদা তার পরিচিত বোট, মালিক মোবারককে সে চেনে, ইসরায়েলি আর সাইপ্রাসের মাঝখানে চোরাই পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করে। আগলারদের বোট থেকে নিয়মিত ঘৃষ খায় সে, এই ঘৃষের টাকায় তেল আবিব আর জেরুজালেমে পাঁচ-সাতটা বাড়ি কিনেছে। কিন্তু ন্যাভাল হেডকোয়ার্টার থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে, প্রতিটি ফিশিং বোট সার্চ করতে হবে, দেখতে হবে বিস্ফোরক আর অস্ত্র আছে কিনা, সঙ্গে কাগজ-পত্র থাকুক বা না থাকুক, বোটে অচেনা বা বিদেশী কোন লোক থাকলে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে। আলবিদার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে পেরেজ। বোটটা তার চেনা, কিন্তু মোবারককে দেখা যাচ্ছে না। তবে চেনা এক লোককে দেখতে পাচ্ছে সে-শাফি। শাফিও আগলার, তবে তার নিজস্ব বোট নেই, ভাড়া করা বোট নিয়ে আগলিং করে, তা-ও বছরে মাত্র দু'একবার। প্রশ্ন হলো মোবারকের বোটে শাফি কেন থাকবে? মোবারক তো কাউকে বোট ভাড়া দেয়ার লোক নয়। তাছাড়া, আলবিদায় আর যারা রয়েছে তাদের কাউকেই চেনে না সে।

হেলমসম্যানকে বোট থামাবার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন। আলবিদার কাছ থেকে একশো ফুট দূরে স্থির হলো গানবোট। পেরেজ লক্ষ্য করল, ডেকে দাঁড়িয়ে মাছ ধরছিল শাফি, সঙ্গে আরেকজনকে নিয়ে। গানবোট দেখে জাল গুটিয়ে আনছে তারা। মাছ রাখার ঝড়িগুলোয় কি আছে দেখা দরকার। বোটটাও ভাল করে একবার সার্চ করতে হবে।

হুইলহাউস থেকে গলা বের করে রানা জানতে চাইল, ‘কি ব্যাপার?’

‘রুটিন ইন্সপেকশন,’ জবাব দিল শাফি, রানার দিকে সরাসরি তাকাল না। ‘ক্যাপটেন পেরেজ ঘৃষ খায়, আলবিদায় তুর্কী পতাকা উড়তে আগেও দেখেছে সে। তবে আমাকে এই প্রথম দেখছে। তাকে হয় টাকা দিতে হবে, নাহয় মদের বোতল।’

‘কি যেন বলছ না তুমি?’ চাপা স্বরে অভিযোগ করল নাসের।

রানা জানতে চাইল, ‘শাফি? ঘৃষই যদি খায়, আমাদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে কেন ওরা? আগে কখনও এরকম করতে দেখেছ?’

‘না,’ ইতস্তত করে বলল শাফি। গানবোটের ফোরডেকে দাঁড়ানো নৌ-সেনাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। ‘পেরেজের সঙ্গে ওরা নতুন লোক।’

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল রানা, নিরীহ একজন জেলে যেমন হাসে, খোশমেজাজী ও সরল-গানবোটের নৌ-সেনারা যাতে কিছু সন্দেহ না করে। কিন্তু হাসিটা ওর চোখ স্পর্শ করেনি। তাকিয়ে আছে মরচে ধরা, রঙ চটা বোর দিকে। ডেকে, ব্রিজ-এর পাশে দু'জন লোক রয়েছে, সামনে একটা সেভেনটিফাইভ এমএম গান। ক্যাপটেন ব্রিজ থেকে এখনও বেরোয়নি। ব্রিজের সামনে আরও দু'জন লোক সাব-মেশিনগানের পাশে দাঁড়িয়ে। সাব-মেশিনগান হালকা অস্ত্র, আলবিদার স্টীল বডি'র তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে সেভেনটিফাইভ এমএম গান মোবারকের বোটকে শ্রেফ গুঁড়িয়ে দেবে।

কিন্তু গানগুলো আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা দুই মানুষের মাঝখানে রেডিও এরিয়ালের জঙ্গলটা।

বিপদের সময় বিদ্যুৎবেগে কাজ শুরু করল রানার মাথা। মাত্র একটাই উপায় আছে বিপদ থেকে বাঁচার। শান্তভাবে হেঁটে এসে মেইন হ্যাচ বন্ধ করে দিল ও। পেট্রল বোটের উদ্দেশ্যে হিফ ভাষায় চেষ্টাতে শুরু করেছে শাফি। গানবোট থেকেও চিৎকার করছে ওরা। ডেক থেকে জাল তুলে এক পাশে সরিয়ে রাখল রানা, তারপর ফিরে এল হুইলহাউসে। 'শুয়ে পড়ুন,' লায়লাকে বলল, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শাফির হাত থেকে নিজের হাতে নিল হুইল, তারপর বন বন করে স্টারবোর্ডের দিকে ঘোরাল সেটা। ঘুরে গিয়ে নাক বরাবর সোজা গানবোটের দিকে ছুটল আলবিদা, ঠিক মাঝখানে আঘাত করবে।

মেগাফোনে হুন্সার ছাড়ছে পেরেজ। এটা তার একটা ভুল। যখন বুঝতে পারল চেষ্টায়ে কোন লাভ নেই, আলবিদা বিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। সেভেনটিফাইভ এমএম একবার মাত্র গর্জে উঠল। আলবিদার হুইলহাউসকে পাশ কাটিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল শেল, বিস্ফোরিত হলো দুশো গজ-দূরে ঝাড়া পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। সাব মেশিনগান থেকে ফায়ার শুরু হলো। গানবোট চেউয়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে, বুলেটগুলো হাত-পাখার আকৃতিতে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। অকস্মাৎ আলবিদার ফোরহ্যাচ থেকে যমদূতের মত উদয় হলো শামিম আর হাসান। উজির ব্রাশ ফায়ারে ইসরায়েলি গান ক্রুদের ঝাঁঝা করে দিল শামিম। রঙে ভেসে গেল ডেক। একজন কি দু'জন ডাইভ দিয়ে আড়াল নিল। মরুক বা না মরুক, ওরা আগ্নেয়াস্ত্রের কাছ থেকে দূরে থাকলেই খুশি শামিম। হাসানের টার্গেট সাব মেশিনগান ক্রু। তার গুলি করা শেষ হতে আলবিদা একটা চেউয়ের নিচে নেমে এল। গানবোট চেউয়ের মাথায়। একটা বোট উঠছে, আরেকটা নামছে। গানবোটের বাদামী খোলে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল আলবিদার বো। ধাতব সংঘর্ষের কর্কশ আওয়াজে রিরি করে উঠল শরীর। গানবোটে আলবিদার বো প্রায় গঁথে গেছে, ইসরায়েলি গানাররা সাইট যথেষ্ট নিচু করতে না পারায় লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না। এই সুযোগে আবার শামিমের হাতে জ্যান্ত হয়ে উঠল উজি, পেট্রল বোটের খোলে জ্যামিতিক রেখা তৈরি করেছে সে, এমন এক জায়গায় যেখানে রেডিওটা থাকার কথা। চারটে গ্রেনেডের পিন খুলল হাসান, নিচের ঠোঁট বাঁকা হয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেল। পেট্রল বোটের ডেক লক্ষ্য করে একটার পর একটা ছুঁড়ল ওগুলো, ডেকে পড়ে ড্রপ খাওয়ার আওয়াজ হল। কানে হাত দেয়ার

সময় পেল না, তার আগেই ওগুলো বিস্ফোরিত হলো একের পর এক। ইংরেজি টি হরফের মত জোড়া লেগে আছে বোট দুটো, আলবিদার বো পেট্রল বোটের ভেতর বেশ খানিকটা সেধিয়ে গেছে। ওটার মরচে ধরা প্লেটে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

বোটের তলায় একটা ঢেউ এল। আলাদা হয়ে গেল বোট দুটো। ইস্পাত ভাঙা বা ছেঁড়ার শব্দ অসহ্য লাগল কানে। হুইল ঘুরিয়ে আলবিদার বো আরেক দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে রানা।

‘ফায়ার!’ গর্জে উঠল ক্যাপটেন পেরেজ। গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ তার কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। রেডিওর এরিয়াল ধ্বংস হয়ে গেছে, ছেঁড়া ঝুরির মত দোল খাচ্ছে বাতাসে। ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ক্যাপটেন, সেই সঙ্গে অনুভব করল গানবোটের নাড়াচড়ায় আড়ষ্ট একটা ভাব এসে গেছে। ‘ফায়ার!’ আবার গর্জে উঠল। ইতিমধ্যে বিশ গজ দূরে সরে গেছে আলবিদা। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেন দেখল সাব মেশিনগানের ত্রুটি ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে, একজনও নড়ছে না। ফোরডেকের সেভেনটিফাইভ-এমএম অক্ষত, কিন্তু আশপাশে গানাররা কেউ নেই। হঠাৎ অনুভব করল, তার পা ভিজে। বুঝতে বাকি থাকল না যে গানবোট ডুবে যাচ্ছে। সাহায্য পাবার জন্যে মুখ খুলতে গেল, কিন্তু কোথায় রেডিও? তারপর ভাবল, রেডিওর অপরপ্রান্তে তার কাজিন কি ভাবত যদি শুনত যে একদল স্বাগলার ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একটা পেট্রল বোট ডুবিয়ে দিয়েছে?

পেরেজ উপলব্ধি করল, তার আয়ু শেষ। শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল সে, চেহারা কঠিন, মুখ বন্ধ।

বিশ সেকেন্ড পর পানির তলায় তলিয়ে গেল গানবোট। প্রচুর বুদ্ধদ ছাড়া আর কিছু দেখার থাকল না। একটু পর শুধু একটা টুপি ভেসে উঠল সারফেসে।

দুপুরের দিকে মেঘ কেটে যেতে শুরু করল। সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত নয় হাসান, বারবার বমি করছে। পাম্পের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে শামিমকে, তার কোন ক্লান্তি নেই। বারোটার পর ফিশ-হোস্টে নেমে এল রানা। ‘ব্রিফিং,’ বলল ও। ‘তোমরা রেডি?’

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল শামিম। হাসানও ঝাঁকাত, কিন্তু তাতে শক্তিক্ষয় হয়, সে তার শক্তি সঞ্চয় করছে সত্যিকার প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্যে।

রানা বলল, ‘আমরা একটা বে-তে ঢুকেছি। খোলা সাগরের দিকে একটা পাহাড়-প্রাচীর আছে। মোবারক বলে গেছে, ওটা বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। তার মানে ইসরায়েলি সৈন্যরা ওদিকে নজর রাখবে না। অন্তত আশা করতে দোষ নেই।’

নিশ্চিন্ততার ভেতর শুধু এঞ্জিনের একঘেয়ে শব্দ আর দূর থেকে ভেসে আসা পাখরের ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ার গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

‘সন্ধের পরপরই ডিঙিতে চড়ব আমরা,’ বলল রানা। ‘শাফি, নাসের আর লায়লা আলবিদা নিয়ে হারবারে চলে যাবে। জেলেদের অভিনয় করবে, বোট মেরামত করতে চাইবে। দায়ান দায়ান হারবারের দিকটায় ইসরায়েলি সৈন্যদের ডিফেন্স সিস্টেম খুব শক্তিশালী হবার কথা। সাগরের দিকটায় যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তেমন কোন আয়োজন নেই ওদের। কারণটা ওই খাড়া পাহাড়। আমরা পাহাড়ে চড়ব

রাতে ।’

‘যে পাহাড়ে চড়া সম্ভব নয়...’

‘আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতেই এসেছি,’ হাসানকে থামিয়ে দিল রানা । ‘আমাদের কিছু ইউনিফর্ম দরকার হবে, রিয়াজের প্যাকে যদি পাওয়া না যায় । হাসান, ইকুইপমেন্ট চেক করার কাজটা তোমার । ভাল কথা, সবাই দাড়ি কামিয়ে নাও । কোন প্রশ্ন?’

‘ডিঙি থেকে পাহাড়ে আমরা চড়ব কিভাবে?’ জিজ্ঞেস করল হাসান । ‘একের পর এক ঢেউ এসে আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে ।’

টেবিলের ওপর চার্টের ভাঁজ খুলল রানা । ‘ঢেউ আসছে পশ্চিম দিক থেকে । ওখানে একটা গুহার কাছাকাছি বা মুখে আড়তদার পারভেজের ভাঙা বোট এখনও নাকি আছে । শাফি আগাকে জানিয়েছে, জাহাজটা ওখানে থাকার ফলে ঢেউ বাধা পায়, ফলে পানির সারফেস মাঝে মধ্যে সমান থাকে ।’

‘মাঝে মধ্যে ।’

‘জোয়ার শুরু ও শেষ হবার মাঝামাঝি সময় । লগ্নটা আসবে আজ রাত একুশ ঘণ্টায় ।’

শামিম বলল, ‘একুশ ঘণ্টায় অন্ধকার পুরোপুরি গাঢ় হবে না ।’

‘সাদে একুশে হবে ।’

‘অনেক কথা হয়েছে, এবার আপনাদের পেটে কিছু পড়া দরকার, তারপর খানিক বিশ্রাম,’ বলল লায়লা । ‘আমি দেখছি খাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় ।’

‘তুমি ক্লান্ত,’ ঝট করে সিধে হলো নাসের । ‘খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি ।’

স্বামীর দিকে কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লায়লা । ক্ষীণ একটা সন্দেহ জাগল, নাসের কি তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না? সবার দিকে পিছন ফিরল সে, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল । গ্যালিতে চলে গেল নাসের ।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে হাসান শুতে চলে গেল । লায়লাকে নিয়ে ডেকে উঠে গেছে নাসের, ওদের সঙ্গে শাফিও আছে । রানা আর শামিম নিচু গলায় কথা বলছে ।

‘কি ভাবছ, মাসুদ ভাই?’ জিজ্ঞেস করল শামিম, ইঙ্গিতে টেবিলে পড়ে থাকা চার্টটা দেখাল ।

‘হেলাল জাললু সাবমেরিন লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা, তাতে কোন সন্দেহ নেই ।’

‘পেট্রল বোটটা এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেমের অংশ ছিল?’ জানতে চাইল শামিম ।

‘শাফি কি বলল, শোনোনি? ক্যাপটেন পেরেজ বাদে বাকি সব সৈন্যরা নতুন, আগে তাদেরকে গানবোটে ডিউটি দিতে দেখা যায়নি ।’

‘তবে,’ বলল শামিম, ‘ওটা রুটিন পেট্রল ছিল ।’

‘বেগ ইয়োর পার্ডন?’

‘নির্দিষ্ট কোন ইনফরমেশন পেয়ে আসেনি ওরা ।’

কাঁধ ঝাঁকাল রানা । ‘নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই ।’

‘তা ঠিক ।’

‘সঙ্গী সবাইকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?’ কয়েক মুহূর্ত পর শামিমই আবার মুখ খুলল।

প্রশ্নটা নিয়ে রানাও চিন্তা করছিল। শাফি স্বাগলার, দু’নম্বরী ব্যবসায় সে অভ্যস্ত। নাসের অত্যন্ত সাহসী, শিক্ষিতও বটে, কিন্তু তার আচরণ সব সময় যৌক্তিক মনে হয়নি ওর। আর লায়লা—যেহেতু কয়েকবার ইসরায়েলি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছিল, তাকে নিজেদের কাছে রাখাই সবদিক থেকে নিরাপদ। ‘উপায় নেই, এদের সাহায্য নিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে।’

মাথা ঝাঁকাল শামিম।

অকস্মাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল হাসান, চেহারায় রক্ত নেই। রানার প্রথমে সন্দেহ হলো, হাসানকে গুলি করা হয়েছে। কিন্তু না, আলবিদার দু’লুনি সত্ত্বেও হাঁটতে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। তার হাতের বাক্সগুলোর দিকে তাকাল রানা, তামার পাত দিয়ে মোড়া। ওগুলোয় প্রচুর এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজ আছে। ‘আগে তোমার ঘুমিয়ে নেয়া দরকার, হাসান, তা’পর ইকুইপমেন্ট চেক করবে।’

মাথা নাড়ল হাসান। কথা বলছে না। যেন এমন কিছু ঘটেছে, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। টেবিলের ওপর পাশাপাশি বাক্সগুলো নামিয়ে রাখল সে। ল্যাচ খুলে ঢাকনি তুলল, ইঙ্গিতে তাকাতে বলল ভেতরে।

মেহগনি কাঠের বাক্স দুটোয় ইসরায়েলি তিনটে সাবমেরিনকে ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্ফোরক ছিল। ভেতরে চোখ পড়তেই মুখ শুকিয়ে গেল রানার। ছ’ঘণ্টা অতীতে ফিরে গেল ও। মোবারকের বাড়ি থেকে নাহিদকে গোলাঘরে রেখে ফিরে এল হাসান, তার একটু পরই মোবারকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকায় ওরা, সমতল পাহাড় চূড়া অর্থাৎ খেত ধরে এগোয়। চূড়ার কিনারা থেকে নিচের জেটি আর সেতুদের ওপর নজর রাখছিল, এই সময় দলবল নিয়ে ওখানে হাজির হয় হিব্বুল্লাহ মিলিশিয়ার সাবেক কমান্ড্যান্ট খলিল আহমেদ। রানা তাকে নির্দেশ দেয়, গোলাঘর থেকে রিয়ারগার্ড-এর দায়িত্ব পালন করতে হবে, মেজর নাহিদের নেতৃত্বে। তখনই হাসানের চাপা গলা শুনতে পায়—‘এই, এই, সাবধান! সরে এসো ওখান থেকে।’ রানা দেখতে পায়, কমান্ড্যান্টের কয়েকজন সঙ্গী স্তূপ করা ইকুইপমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে কি সব নাড়াচাড়া করছে।

সন্দেহ নেই, তখনই বাক্স থেকে এক্সপ্লোসিভ আর ফিউজগুলো সরিয়ে ফেলে ওরা।

যেন পাঁচ সেকেন্ড নয়, পাঁচ বছর পর নিস্তক্ৰতা ভাঙল শামিম, ‘হায় খোদা! এখন যদি ঘুমাতে না যাই, হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে।’

‘আমারই ভুল,’ অপরাধ স্বীকার করল হাসান। ‘ইকুইপমেন্টে ওরা হাত দিয়েছে দেখার পর চেক করা উচিত ছিল।’

রানা শুধু বলল, ‘আমাদের কাছে গ্রেনেড আছে।’ তবে জানে, আর মাত্র দশটা আছে। দশটা গ্রেনেড দিয়ে তিনটে সাবমেরিন ধ্বংস করার চিন্তা কোন পাগলও করবে না।

‘মাত্র চারটে,’ বলল হাসান, রানাকে আরেকটা ধাক্কা দিল। ‘পেট্রল বোটে আটটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গ্লেঞ্চ দিয়ে কিছুই হবে না, সাবমেরিনের প্রেশার হাল ভাঙা গ্লেঞ্চের কাজ নয়।’

হাসানের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আশা করছে সমস্যার একটা সমাধান সেই বের করবে।

‘মোবারক কি বলেছিল, মনে আছে, মাসুদ ভাই?’ হাসানের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। ‘দুর্গে একটা ম্যাগাজিন অর্থাৎ গোলাবারুদের গুদাম আছে। মাঝে মধ্যে ওদেরকে লঞ্চের আর টিউবে মিসাইল ও টর্পেডো লোড করতে হয়, তাই না? ওগুলো সাবমেরিনের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে ফেলে, কাজেই মেরামত করার সময় সাবমেরিনে রাখা সম্ভব হয় না।’ হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল সে। ‘তাই বলছি, বিস্ফোরক নিয়ে চিন্তার কিছু নেই তাছাড়া, এঞ্জিনও তো আছে, তাই না? হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড, ফ্যুয়েল অয়েল, ওয়াটার। হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড বড় ইন্টারেস্টিং জিনিস।’ বাক্স হেড়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। ‘গন্ধটা পেলে মনে হবে কোন হেয়ারড্রেসার-এর পার্লারে রয়েছে।’ চোখ বুজল সে।

রানা জানতে চাইল, ‘হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড সম্পর্কে কি বলতে চাইছ তুমি?’

কিন্তু হাসান ঘুমিয়ে পড়েছে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর রানাও ঘুমিয়ে পড়ল।

সারাটা বিকেল জুড়ে আবার মেঘ ডামতে শুরু করল আকাশে। ডেকে বেরিয়ে আসার পর গাঙচিলের চিৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল রানার। বে থেকে আবার সাগরে বেরিয়ে এসেছে আলবিদা। কালো মেঘের ছাদে ম্লান দেখাচ্ছে সূর্যটাকে। সূর্যাস্তের আরও বিশ মিনিট বাকি, অথচ লাল বলতে যেন কিছুই নেই ওটায়। খাতব একটা প্রকাণ্ড চোখের মত পানির দিকে তাকিয়ে আছে, মেঘ যেন শুষে নিয়েছে সমস্ত বড়-আলবিদাকে কালো দেখাচ্ছে, সাগরের পানি ধূসর বাদামী, পাহাড়-প্রাচীর বিবর্ণ স্লেট।

পাহাড়-প্রাচীরের রেখা অকস্মাৎ উঁচু হয়ে কুঁজ-এর আকৃতি পেল, কিনারাগুলো খাড়া। একদিকে কিনারা থেকে পাঁচিলটা সরাসরি সাগরে নেমেছে। কাঠামোটা দেখতে অনেকটা হেলমেটের মত। হেলমেটের ঠিক মাঝখানে মোটা ও সাদা পেন্সিলের মত কিছু একটা রয়েছে, আকাশের দিকে তাক করা। লাইটহাউস। লাইটহাউসের মাথায় ডান দিক ঘেঁষে একটা টাওয়ার। দুর্গের জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না, হেলাল জাললু হারবারকে কাভার করছে। চোখের বিনকিউলার রিজ-এর শিরদাঁড়ার ওপর স্থির করল রানা।

একটা কাঠামো দেখা গেল, কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না-পেনিনসুলার গলায় তৈরি করা হয়েছে। চিনতে না পারলেও আন্দাজ করল রানা। পাথরের একটা পাঁচিল, সম্ভবত একটা ব্যাটলমেন্ট ও পানি ভরা পরিখা। সন্দেহ নেই, দুর্গটাকে সুরক্ষিত করার জন্যে ইসরায়েলিরা বেড়া আর ট্রেঞ্চও তৈরি করেছে।

বোটের সামনে চলে এল রানা। হইলে রয়েছে শাফি। ‘হেলাল জাললুতে

তোমার পরিচিত কেউ আছে?’

‘তারা সবাই স্বাগলার,’ জবাব দিল শাফি।

‘তা হোক। রিপেয়ারে কত খরচ পড়বে হিসেব করো।’ হুইলহাউসের রেডিও সেটটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। ‘ওটা কাজ করছে?’

শাফি হাসল। ‘স্বাগলারদের রেডিও সব সময় কাজ করে।’

‘সুইচ অন করে রাখো। তারপর চলো তীরে ভিড়ি।’

‘তীরে আপনারা যাচ্ছেন কিভাবে?’ শাফি জিজ্ঞেস করল।

‘দেখি কিভাবে যাওয়া যায়।’ অপারেশনের এই পর্যায়ে প্রয়োজন না থাকলে কাউকে কিছু না জানানোই ভাল। হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বিশ ঘণ্টা পনেরো মিনিট। ‘কাল পনেরো ঘণ্টায় তোমাদের কাছে ফিরে আসব আমরা। জেলেদের জেটির কাছে থাকবে। বোট চড়া মাত্র রওনা হয়ে যাব আমরা।’

‘গন্তব্য?’

‘এখনও জানি না,’ রানার নির্লিপ্ত জবাব।

দায়ান দায়ান পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল শাফি। ‘আগ্লাহ সহায়,’ বিড়বিড় করল সে

আলবিদা ঘুরে গেল। সূর্য ইতিমধ্যে দ্রুত নামতে শুরু করেছে। খানিক পরই অন্ধকার হয়ে এল চারদিক।

সাত

এক ঘণ্টা পর ডিঙি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা, শামিম ও হাসান; ভূমধ্যসাগরের সাত ফুট উচু ডেউ ওটাকে নিয়ে খেলছে। আলবিদার এঞ্জিনের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে পূর্ব দিকে। ডিঙিতে ওদের সঙ্গে তার ভরা ক্লাইসিং রোপ আছে দুই প্রস্থ, নিখুঁতভাবে কুণ্ডলী পাকানো প্রতিটি। উজির সঙ্গে আছে অতিরিক্ত পাঁচটা করে স্পেয়ার ম্যাগাজিন আর আছে গ্রেনেডগুলো। সাধারণ ইসরায়েলি সৈনিকের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছে, ক্যামোফ্লেজ শার্ট ও ট্রাউজার, মাথায় স্টীল হেলমেট। আলবিদা থেকে দুর্গের কিনারায় এই ড্রেস পরা সৈনিকই দেখেছে ওরা। রানার সঙ্গে পিটন আছে, পাহাড়ে চড়ার সময় কাজে লাগবে। বাকি যা দরকার হবে, সব ওদেরকে সংগ্রহ করতে হবে দায়ান দায়ান থেকে।

বোটের বোতে বসে আছে হাসান, হাঁটু জোড়া কানের কাছাকাছি, হাতে মেশিন পিস্তল। একনাগাড়ে বৈঠা চালাচ্ছে শামিম, তাকে একটা মেশিন বললেই হয়, ক্লান্ত হতে জানে না। সামনে তাকিয়ে ফেনার সাদা একটা রেখা দেখতে পেল, তৈরি হচ্ছে বিরতিহীন ডেউ পাথরে আছড়ে পড়ায়।

হাত তুলল রানা, ‘ওইদিকে।’

সাদা রেখার মধ্যে একটা ফাঁক দেখা গেল, ডেউ যেখানে ফণা নামাতে বাধ্য হচ্ছে। পাহাড়ের জলমগ্ন পাঁচিলের কাছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বোন্ডারগুলোর

মাঝখানে মাছের আড়তদার পারভেজের বোট এখনও আটকে আছে। হাসান ভাবল, পাহাড় বেয়ে সত্যি যদি ওপরে ওঠা সম্ভব হয়, ইসরায়েলিদের দারুণ একটা চমক দেয়া হবে। তবে আমরা যদি বাঁচি, এরচেয়ে বড় চমক আমাদের জীবনে আর ঘটবে বলে মনে হয় না।

বড় একটা ঢেউ-এর মাথায় চড়ল বোট, নিচে নেমে প্রায় সমতল পানিতে পড়ল। বৈঠা দিয়ে গভীরতা মাপতে গিয়ে সাগরের তলায় পড়ে থাকা বোল্ডারের অস্তিত্ব টের পেল শামিম। পরমুহূর্তে জলমগ্ন একটা বোল্ডারে ধাক্কা খেলো বোটের তলা। বো থেকে ছিটকে পড়ে গেল হাসান, একটা ঢেউ ওকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে ভারী অস্ত্র রয়েছে, ডুবেই যাচ্ছিল সে। হঠাৎ তার কলার ধরে টান দিল কেউ। একটা জলাবর্তের মধ্যে পড়তে যাচ্ছিল হাসান, কলারে টান পড়ায় বেঁচে গেল। 'তীরে পৌঁছে তোমার প্রথম কাজ এখন অস্ত্রগুলো চেক করা, গলাটা শামিমের, সে-ই তাকে টেনে তুলেছে।

পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় চূড়া আর ফাটল থেকে খসে পড়া জলমগ্ন বোল্ডার ছড়িয়ে আছে। এই বোল্ডারে ধাক্কা খেয়েই ভেঙে গিয়েছিল ফিশিং বোটটা, কিন্তু ডোবেনি, ঢেউয়ের ধাক্কায় পানির ওপর জেগে থাকা বোল্ডারের দুটো স্তূপের মাঝখানে আটকে আছে।

ওদের ডিঙি ভেঙে গেছে, অন্ধকারে সেটার কোন হিন্দিস নেই। আড়তদারের বোটের ডেক এত পিচ্ছিল আর কাত হয়ে আছে যে, রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে গেল ওরা। এরইমধ্যে নিজের উজিটা শামিমের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, কাঁধে তুলল কুণ্ডলী পাকানো একপ্রস্থ রশি, তারপর নিকষ কালো পাহাড়-প্রাচীরের দিকে এগোল। বুটের তলায় স্পাইক লগানো আছে, তা নইলে এই ডেকে হাঁটা সম্ভব হত না।

প্রথম দশ ফুট বোল্ডার, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে, তবে খাড়া নয় সাবধানে, দ্রুত উঠে এল রানা, হাতে নরম ও সচল কি যেন ঠেকল-শ্যাওলা নয়, জৌক। তারপর বালির ওপর গজানো কিছু ঘাস বা গুল্ম ঠেকল আঙুলে। ওগুলোকে ছাড়িয়ে পাথরের গায়ে ফাঁক-ফোকর খুঁজছে রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, তবে আঙুলের চাপ খেয়ে পাথরের ছাল খসে পড়াটা অনুভব করতে পারল। দূর থেকে দেখে নিরেট মনে হলেও, আসলে তা নয়।

খুব সাবধানে, একটু একটু করে উঠছে রানা। পাহাড়-প্রাচীরের গা পচা পনিরের মত নরম, অন্তত বাইরের আবরণটুকু। গায়ে গর্ত বা ফাটল আছে, কিন্তু সবগুলোই শ্যাওলা বা গুল্ম ভরা, হাত ঢোকাবার জন্যে আঙুল দিয়ে প্রথমে সেগুলো পরিষ্কার করতে হচ্ছে। গর্তগুলো এত ছোট, ভেতরে কঁজি পর্যন্ত ঢোকে না। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উঠছে রানা, প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছে গর্তের কিনারা এই বুঝি আলগা হয়ে গেল। তা যদি যায়, সরাসরি নিচের বোল্ডারে পড়বে ও-একটা হাড়ও আঁস থাকবে না।

দশ মিনিট পর একটা ছন্দ এসে গেল, সেটাকে প্রায় স্বয়ংক্রিয়ই বলা চলে। পাহাড়ে চড়ার সময় যা সাধারণত ঘটে আর কি-প্রতি মুহূর্তে গর্ত খোঁজা, পাওয়া গেলে কিনারা পরিষ্কার করে ভেতরে আঙুল ঢোকানো, মনে মনে প্রার্থনা করা কিনারা

যাতে খসে না পড়ে বা গুঁড়ো না হয়ে যায়। রানা ঠিক ক্রল করছে না, অনেকটা সীতরানোর ভঙ্গিতে উঠছে।

সবুদ ফুট ওঠার পর সাগরের ছঙ্কার কমে এল, কিন্তু বাতাসের গর্জন বেড়ে গেল। এখনও অন্ধের মত উঠছে রানা। হঠাৎ নিজেকে আর অন্ধ মনে হলো না। অন্ধকার থেকে আলোয় উঁচু হলো একটা হাত, পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ছাড়িয়েছে। মাথা আরেকটু তুলতে আকাশ দেখতে পেল রানা, তা-ও কালো, তবে গাঢ় নয়, দু'একটা তারাও জ্বলছে, মেঘের আড়ালে এক চতুর্থাংশ চাঁদও ম্লান আলো ছড়াচ্ছে।

পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ধরে ঝুলে আছে রানা, এক পাশ থেকে কে যেন কাশি দিল। পাথরের গায়ে পাথর হয়ে গেল ও। টকটকে লাল আলো জ্বলল ওর কাছ থেকে চার কি পাঁচ গজ দূরে, জ্বলেই নিভে গেল। টর্চ নয়, সিগারেট। তারপর হুড লাগানো একটা টর্চ জ্বলল, সেটাও জ্বলেই নিভে গেল। অন্ধকারের ভেতর সেই আলোতেই ইঁট গাঁথা একটা কাঠামোর খানিকটা আভাস পেল ও। কংক্রিট বা পাথরের তৈরিও হতে পারে, অর্ধচন্দ্র আকৃতির। একটা স্ট্রংপয়েন্ট।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। কাঠামোটা নতুন নয়, প্রাচীন বলে মনে হলো। চাঁদের আলোয় কি যেন চকচক করছে, কাত করা ছোট একটা চিমনির মত। চিনতে পারল রানা-লাইট মেশিন গান।

খাপ থেকে ছুরিটা বেরিয়ে এল হাতে। সিগারেটের আগুন দূরে সরে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় নয়, কার্নিসে উঠে এল রানা। ক্রল করে এগোচ্ছে, থামছে, কান পাতিছে, তাকাচ্ছে চারদিকে, তারপর আবার ক্রল করছে। পাথরে গাঁথা পাঁচিলের গোড়ায় এসে ধীরে ধীরে সিঁধে হলো। জুতো আর মোজা খুলে ঝুলিয়ে নিল গলায়। দুশো ফুট নিচে গর্জাচ্ছে সাগর। পাঁচিলের মাথায় বুট পরা একজোড়া পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে-চার কদম ডানে এগোয়, থেমে যোরে, চার কদম বামে এগোয়।

অপেক্ষা করছে রানা। বুটের আওয়াজটাকে ডান দিকে চার কদম এগোতে দেবে, কিন্তু বাম দিকে মাত্র দু'কদম।

বড় করে শ্বাস টানল রানা। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল বেয়ে এত দ্রুত উঠল, যেন ছুটন্ত একটা মাকড়সা।

ইসরায়েলি সেন্ত্রির চওড়া পিঠ ওর সামনে। লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, সিগারেট ধরাচ্ছে আরেকটা। ছুরির হাতলটা রানার দাঁতে চাপা ছিল, চলে এল হাতে।

একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। এক পা সামনে বাড়ল রানা, পায়ের তলায় চাপা পড়ল একটা গিরগিটি। আঁতকে উঠে পা তুলতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, পাঁচিলের কিনারা থেকে শরীরটা খসে পড়ছে নিচে। আর ঠিক তখনই, চাঁদটাও সময় পেল না, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আবার।

পাঁচিলের কিনারায় একটা হাত, ঝুলে আছে রানা, তাকিয়ে আছে একজন নয়, দু'জন ইসরায়েলি সৈনিকের হাঁ করা মুখের দিকে। গাধা গাধা গাধা, নিজেকে তিরস্কার করছে রানা; সেই সঙ্গে অনুভব করছে পাঁচিলের পিচ্ছিল কিনারা থেকে হড়কে নেমে যাচ্ছে আঙুলগুলো। শরীরের ভার ধরে রাখতে পারছে না হাতটা, পেশীতে টান পড়ছে। অপেক্ষা করছে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঙুলগুলো ঝেঁতলে দেয়া হবে, চিৎকার করে গ্যারিসনের বাকি সব ইসরায়েলিদের সাবধান করে দেয়া

হবে...

ইসরায়েলি দু'জন এতটাই হতভম্ব, সমস্যার সহজ সমাধান ভুলে গেছে। রানার হাতে রাইফেলের বাড়িও মারছে না, বুট দিয়ে আঘাতও করছে না। চিৎকার করলে গ্যারিসনের পাঁচশো সৈন্যকে সাবধান করে দেয়া যায়, সেটাও ভুলে গেছে।

মাথায় এবার বুদ্ধি খেলল। হিব্রু ভাষায় সাহায্য চাইল রানা, 'হেলপ!'

বাচনভঙ্গিতে কোন ক্রটি নেই, ফলে ইসরায়েলি দু'জন দ্বিধায় পড়ে গেল—এ তো কোন শত্রু নয়, বিপদে পড়া নিজেদের লোক...

'হাতটা ধরো,' আবার বলল রানা। 'তা না হলে পড়ে যাব নিচে।'

ইতস্তত ভাব কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল একজন সৈনিক, রানার হাত ধরল হাতটা ধরতেই লাফ দিল রানা, পাঁচিলে উঠেই সৈনিকের চোখের ভেতর দিয়ে মগজে ঢুকিয়ে দিল ছুরির ফলাটা। দ্বিতীয় লোকটা পিছনে ছিল, তারপরও সঙ্গীকে ঝাঁকি খেতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। হ্যাঁ করছে, চিৎকার করবে। ইতিমধ্যে প্রথম সৈনিকের চোখ থেকে ছুরি বের করে এনেছে রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পাঁচিলের নিচে ফেলে দিয়েছে শরীরটা। লোকটার চিৎকার থামানো সম্ভব নয়, কারণ চার-পাঁচ হাত দূরে রয়েছে সে। ছুরিটা ছুঁড়ে মারা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চাঁদের আলোয় ঝিক করে উঠল রক্তে ভেজা লম্বা ফলাটা, দ্বিতীয় সৈনিকের গলায় গুঁথে গেল হাতল পর্যন্ত। গলায় বিধে আছে ছুরিটা, তারপরও এগিয়ে আসছে লোকটা, পিছনে লম্বা হয়ে আছে এক প্রস্থ রশি। লোকটা চিৎকার করতে পারছে না, তবে চোখ দুটো বিস্ফারিত ও নিষ্পলক। একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিল সে। তখনই রানা খেয়াল করল, লোকটার কোমরে কুণ্ডলী পাকানো রয়েছে রশিটা।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রানা, ওকে নিয়ে পাঁচিলের নিচে খসে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক। খসে পড়ার সময় পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে ওরা। নিচের দিকে তাকিয়ে সরু কার্নিসটা দেখতে পেল না রানা। ত্রিশ ফুট নেমে এল, তারপর প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো জোড়া লাগা দুটো শরীর। আহত সৈনিকের কোমরে বাঁধা রয়েছে রশির একটা প্রান্ত, অপরপ্রান্তটা পাঁচিলের মাথায় কোন গাঁজ বা পিটুনের সঙ্গে আটকানো।

শূন্যে রশির শেষ প্রান্তে ঝুলছে ওরা। লোকটার গলা থেকে ছুরিটা টান দিয়ে বের করল রানা, এক হাতে রশিটা ধরে আছে। সেটা মোটা, তবে তার জড়ানো নয়। তবু রশি নয়, লোকটার কোমরের বেষ্ট কাটল রানা। পাহাড়-প্রাচীরের দেয়াল ঘেষে সৈকতে, স্তূপ হয়ে থাকা বোল্ডারের দিকে খসে পড়ল লোকটা।

'সব ঠিক আছে তো, আহরাম?' পাঁচিলের মাথা থেকে নতুন একটা গলা ভেসে এল।

'সব ঠিক,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, তারপর রশির কুণ্ডলী খুলে নামিয়ে দিল নিচে।

পাঁচ মিনিট পর রশি বেয়ে ওর পাশে উঠে এল শামিম আর হাসান। ইতিমধ্যে আবার কার্নিসে ফিরে এসেছে রানা। রশিটা ওটিয়ে নিয়ে কুণ্ডলী পাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

চাঁদের আলোয় ওদের হেলমেট ঝাঁকি খেতে দেখল রানা। হাতঘড়ির দিকে

তাকাল। বাইশ ঘণ্টা পনেরো মিনিট। 'ঠিক মাঝরাতে জেনারেটরগুলোর কাছে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। রিপেয়ার শেডের সেন্সিটাইভের পালাবদল খেয়াল করবে, শামিম। হাসান, তোমার কাজ অ্যামিউনিশন ডিপো চিনে রাখা।'

বয়সে ছোট হলেও কৌতুক করে হাসান বলল, 'ইয়েস, বস!'

'তোমরা এবার উঠে পড়ো,' নির্দেশ দিল রানা।

কার্নিস থেকে পাঁচিলের মাথায় উঠে কাউকে দেখতে পেল না ওরা। মিচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে রানাকেও দেখতে পেল না, অন্ধকারের ভেতর কালো পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে লেপ্টে আছে। পথ দেখাল শামিম, পাঁচিলের শেষ মাথায় লোহার ধাপ বেয়ে সাবধানে উপরে উঠছে ওরা। প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত উঠতে হলো, চুড়ায় নিচু একটা পাঁচিল, কয়েকটা ধাপ বেয়ে মাথায় উঠতে হবে। প্যারাপিট বা পাঁচিলের মাথায় উঠল শামিম, হাতে এখন উজি, ইউনিফর্ম নোংরা হয়ে আছে। একটু কুঁজোমত হলো সে, জানে রানা যাদের খুন করেছে তাদের তুলনায় কাঠামোটা তার বড়। তবে ভরসার কথা হলো লোহার ধাপ বেয়ে যে লোকগুলো বিপজ্জনক পাঁচিলে নেমে গিয়েছিল, যে পাঁচিলের নিচে পাহাড়-প্রাচীরের খাড়া গা আর সাগর ছাড়া আর কিছু নেই, সেখান থেকে ওই লোকগুলোই ফিরে আসবে, অন্য কেউ নয়-অন্তত প্যারাপিটে যে বা যারা রয়েছে তারা সেটাই ধরে নেবে। বিশুদ্ধ হিংস্রতা সে বলল, 'ভাইরে, নিচে যে কি ঠাণ্ডা!'

দশ গজ চওড়া একটা টেরেসের কিনারা তৈরি করেছে প্যারাপিটটা, আরও এক প্রস্থ ধাপ অন্য একটা পাঁচিল ঘেরা লেভেল থেকে নেমে এসেছে। মরচে ধরা প্রাচীন এক সারি কামান দেখা গেল একদিকে। কামান সারির শেষ প্রান্তে একজোড়া ছায়ামূর্তি, সামনে একটা মেশিন গান। তাদের একজন জবাব দিল, 'শালার শীত এখানেই কি কম!'

প্রাইভেট, সাধারণ সৈনিক, বুঝতে পারল শামিম। আশা করা যায় কোন সমস্যা হবে না। 'কফি,' বলল সে।

'পালা বদলের সময় হলে বাঁচি, দ্বিতীয় লোকটা বলল। 'মাঝরাতে র জন্যে আরও এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকাল শামিম। কিনারা থেকে উকি দিয়ে নিচে তাকাল একবার রানাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'জলদি করো, কি বললাম!'

টেরেসে পৌঁছল হাসান।

'কফি নিয়ে নিচে নেমে যাব আমরা, শামিমের গলায় কর্তৃত্বের সুর, দুই ইসরায়েলি সৈনিকের কানে স্পষ্ট ভাবেই বাজল সেটা। শামিম আশা করেছে, তাকে একজন অফিসার বলে মনে করুক ওরা। অফিসারের কথায় যুক্তি থাকে, সব সময় সে যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয় না।

'মার্চ!' নির্দেশ দিল শামিম।

সামনে থাকল হাসান, পাথুরে ধাপ বেয়ে টেরেস থেকে টপ লেভেলে উঠে এল ওরা। 'রাইট টার্ন!' নির্দেশ দিল শামিম।

সমতল একটা বিশাল চাতাল ধরে মার্চ করেছে ওরা, পাথরের তৈরি, চাঁদের আলো রূপালি লাগছে। ওদের ডান দিকে রেইলিং বা নিচু পাঁচিল, কিনারা নির্দেশ

করছে। সামনে ও বাম দিকে জমিন ঢালু হয়ে নেমে গেছে কালো গহবরে, আরও অনেক দূরে হেলাল জাললুতে অল্প কিছু হলদেটে আলোর ক্ষীণ আভাস। বাম দিকে, খুব কাছে গার্ডহাউস, জানালার কাঁচগুলো নিখুঁতভাবে ঢাকা হয়নি, আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে। ওদের সরাসরি পিছনে প্রাচীন একটা ব্যাটলমেন্ট, মাথার ওপর আধুনিক কাঁটাতারের বেড়া, সম্ভবত শহরের দিকে মুখ করা গোটা স্নাহাড়-প্রাচীর জুড়ে বিস্তৃত

দুর্গের ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। তবে হাঁটছে বিপজ্জনক খোলা জায়গায়।

গার্ডহাউসের ভেতর থেকে একটা বেল বেজে উঠল, সেই সঙ্গে শুরু হলো এক লোকের কমান্ড। প্যারেড-গ্রাউন্ডে জড়ো হবার তাগাদা? নাকি ইমার্জেন্সী ওয়ার্নিং? অকস্মাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। জ্যাকবুট পরা লোকজন একের পর এক দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে আসছে, চাতালে দাঁড়াচ্ছে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। দরদর করে ঘামতে শুরু করল হাসান। পাঁচশো ইসরায়েলি সৈন্যের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা।

শামিম নির্দেশ দিল, 'হল্ট!' স্থির হয়ে গেল হাসান।

দুর্গের ভেতর ঢুকেছে ওরা ঠিকই, তবে পুরোপুরি নয়। ফ্লাডলাইটের আলো জ্বলে ওঠায় এতক্ষণে দ্বিতীয় বেড়াটা দেখতে পাচ্ছে ওরা, দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় এগিয়েছে, পনেরো ফুট উঁচু, ইনসুলেটর-এর মাঝখানে কাঁটাতার, পাহাড়ি-প্রাচীরের কিনারা থেকে হারবারের কালো পানি পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই বেড়ার মাঝখানে প্রতিটি ইঞ্চি, প্রতিটি কাঁকর, একশো কি একশো পঁচিশজন ইসরায়েলি সৈন্যের প্রতিটি বোতাম আর বাকল, মেইন গেটের দু'ধারে বসানো বালির বস্তার ভেতর একজোড়া মেশিনগান পোস্ট দিনের উজ্জ্বল আলোর মত পরিষ্কার। হাসানের কপালের পাশ থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। তার পাশে বিশাল শরীর নিয়ে স্থির হয়ে আছে শামিম।

ভেতর দিকের বেড়ার মাঝামাঝি জায়গায় আরেকটা গেট। সেটা খোলা দু'ধারে আরও বালির বস্তা, তার আড়ালে মেশিনগান। মেশিনগানের পাশে চকচক করছে হেলমেট।

'মার্চ!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল শামিমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, বুকের ওপর উজ্জ্বল দুটো আড়াআড়ি ভাবে চেপে ধরে চাতালের ওপর দিয়ে এগোল দু'জন। সামনে ঝুলে রয়েছে প্রকাণ্ড গেট, ভেতরটা প্রায় অন্ধকার। বালির বস্তার আড়াল থেকে মেশিনগানগুলো ওদের দিকে তাক করা, সরাসরি না তাকিয়েও অনুভব করতে পারছে হাসান। আড়চোখে তাকাতে দেখল, শামিমের হেলমেট একদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে, ক্যামোফ্লেজ ড্রেসে ব্যাঙের আবর্জনা। যে-কোন মুহূর্তে কেউ একজন চৌকিয়ে উঠবে, সেই ভয়ে কান খাড়া করে আছে সে। নিশ্চয়ই কেউ ইসরায়েলি সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়েছে। কামান সারির কাছে বসা লোক দু'জনই হবে। ইচ্ছা করেই দুর্গের অভ্যন্তরে ওদেরকে ঢুকতে দিয়েছে তারা, টেলিফোনে খবর পাঠিয়েছে নোংরা ইউনিফর্ম পরা দু'জন টেরেস থেকে চাতালে আসছে।

হাসান হেঁটে চলেছে। পা উঠতে চাইছে না, হাঁটু দুর্বল, তবু থামার কথা ভাবতে পারছে না। ক্ষীণ একটা আশার আলোও উঁকি দিচ্ছে মানের কোণে। কই, কেউ তো এখনও কিছু বলছে না! কে জানে, এখানে এই মুহূর্তে যা ঘটছে তা হয়তো রুটিন

এক্সারসাইজ।

গেটের দু'ধারের বালির বস্তার কাছে চলে এল। সামনে কালো গেট। ওদের পিছনে কেউ একজন চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে। ডান দিকে তিনজন প্রাইভেট আর একজন ক্যাপটেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অ্যাটেনশন হয়ে আছে। ক্যাপটেনের চোখের মণি উঁচু-নিচু হতে দেখল হাসান। চোখের এই নড়াচড়ার কি অর্থ, জানে সে—বুটে ময়লা আছে কিনা, লেদার স্ট্রাপ-এর পালিশ ঠিক আছে কিনা, দেখছে।

গেট পেরিয়ে অন্ধকারের ভেতর ঢুকে পড়ল শামিম। এই অন্ধকারেই ডক আর সাবমেরিনগুলো থাকার কথা, অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে, হারবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে সৌদি আরব আর কুয়েতের ওপর মিসাইল ছুঁড়বে।

গেট পেরিয়ে বেশ অনেকটা দূরে চলে এসেছে ওরা। হাসানের হেলমেটে ফ্ল্যাডলাইটের আলো এখন প্রায় লাগছেই না। উফ্, বিপদ তাহলে কেটে গেছে!

অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে ধাতব শব্দ ভেসে এল। সামনে আর বাম দিকে যেন সূর্য উঠেছে। একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ইংরেজিতে বলল, 'হাতের অস্ত্র যেন না নড়ে। আপনাদেরকে ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

আলোর দিকে ঘাড় ফেরাল হাসান। চোখ ধাঁধিয়ে গেল, কিছুই দেখতে পেল না। ওদিকে একজনও থাকতে পারে, আবার একশোজনও।

'হাতের অস্ত্র ফেলে দিন!'

উজ্জি ফেলে দিল ওরা। আলোর পিছন থেকে লোকজন এগিয়ে এল। ইউনিফর্মই বলে দিল, এরা সবাই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর সদস্য। চারজন সামনে চলে এল, শামিম আর হাসানকে সার্চ করল দু'জন।

'স্বাগতম, ইরাকী বকুগণ,' মিলিটারি পুলিশের একজন ক্যাপটেন এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল। 'আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আসুন।'

ছোট একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ওদের। কুঁড়েগুলো কাঠের। বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা কংক্রিট বিল্ডিংকে পাশ কাটাল, ভেতর থেকে ডিজেল এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ বেরুচ্ছে—জেনারেটর শেড। এ-সব তথ্য জেনেও আর কোন লাভ নেই, ধরা পড়ে যাওয়ায় কোন কাজে লাগানো যাবে না। বাম দিকে, খানিকটা নিচে, আরেকটা শেড, হাতুড়ি পেটা সহ অন্যান্য আওয়াজ শুনে বোঝা গেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হচ্ছে, অন্ধকারে ঝলসে উঠল আর্ক ওয়েল্ডারের চোখ-ধাঁধানো আলো। একটা কারখানা। অস্ত্র এবং সাবমেরিনের যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়।

'হল্ট!' ক্যাপটেন আদেশ করল।

একটা ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, সামনে পাথরের তৈরি পাঁচিল, আর একটা গেট; গেটটা লোহার বোল্ট দিয়ে আটকানো। পাঁচিলের মাথায় ব্যাটলমেন্ট। গেটের গায়ে ছোট একটা দরজা খুলে গেল, সামনে এগিয়ে গেটকীপারকে পাস দেখাল ক্যাপটেন। গেট হাউসে ঢুকে টেলিফোন করল লোকটা। বেরিয়ে এসে খুলে দিল গেট। হাসানের কিডনিতে মেশিন পিস্তলের খোঁচা লাগল। ভেতরে ঢোকানোর পর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

একটা উঠানে রয়েছে ওরা। ব্যাটেলমেন্টে তিনটে মেশিনগান 'সিকিউরিটি খুব টাইট,' বিড়বিড় করল হাসান।

'ইসরায়েলিদের এটা একটা বড় গুণ।'

'কথা নয়!' হিব্রু ভাষায় গর্জে উঠল ক্যাপটেন।

'বুঝলাম না,' বলল শামিম।

'হিব্রু জানা নেই,' হাসানও বলল।

দু'জনই সামান্য হলেও তৃপ্তি বোধ করল, শত্রুর হাতে বন্দী হলেও এখনও ওদের আস্তিনে একটা কিছু লুকানো আছে

একটা নয়, দুটো। ওদের লীডার রানা এখনও ধরা পড়েনি।

একটা সেলে ভরা হলো ওদের। কৌতুক করে কিছু বলতে চেষ্টা করায় মেশিন পিস্তলের বাড়ি খেলো হাসান কাঁধে। সেলের ছাদ গম্বুজ আকৃতির। দেয়ালে দুশো পাওয়ারের বালব জ্বলছে। ইস্পাতের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে, করিডরে, বুট পরা প্রহরীরা টহল দিচ্ছে।

এগারোটা একত্রিশ মিনিটে পাঁচজন লোক ঢুকল ভেতরে। চারজন মিলিটারি পুলিশ, একজন মোসাড এজেন্ট। এজেন্ট বাদে সবাই ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা মোসাড এজেন্টের বয়স ত্রিশ-এর মত হবে। নীল সুট, গাঢ় নীল টাই। নাকে রুমাল চেপে ধরল সে। 'ইস্, এরচেয়ে তো নরকও ভাল!' চারদিকে চোখ বুলাল। 'চেয়ার।' বন্দীদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি শ্যানন ফেকা, মোসাড এজেন্ট।'

সেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একজন মিলিটারি পুলিশ একটা চেয়ার নিয়ে এল। পায়ের ওপর পা তুলে তাতে বসল শ্যানন ফেকা। শামিম আর হাসান দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, পা দুটো লম্বা করে রেখেছে।

'আমি আপনাদেরকে পালাবার কথা ভুলে যেতে বলব না,' শুরু করল মোসাড এজেন্ট 'কারণ, আশা করি নিজেরাই উপলব্ধি করতে পেরেছেন তা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, সে চেষ্টা করব না আমরা,' বলল শামিম।

'আপনাদের মিশনটা কি ছিল, তাও আমরা জানি,' বলল ফেকা। 'কাজেই সে-ব্যাপারেও কোন প্রশ্ন করব না। মাত্র দুটো প্রশ্ন আছে আমার। আমরা কী প্ল্যান করেছি, আপনারা তা জানলেন কিভাবে? ব্যাপারটা এতই গোপন, বাইরের কারও জানার কথা নয়। কিভাবে খবর পেলেন?'

'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না?' হাসছে হাসান। 'আপনার বস আপনাকে কোন অ্যাসাইনমেন্ট দিলে ব্যাখ্যা করে বলেন গোপন তথ্যগুলো তিনি কোথেকে পেয়েছেন? তথ্যটা যদি জানতে চান, আমাদের বসকে বাগদাদ থেকে হাইজ্যাক করে আনুন।'

ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল শ্যানন ফেকা। তারপর বলল, 'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার সঙ্গী। সে কোথায়?'

হাসান আর শামিম পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর শামিম বলল, 'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল বোঝাবুঝির কোন ব্যাপার ঘটেছে। আমরা এই দু'জনই, সঙ্গে আর কেউ নেই বা ছিল না।'

'কি বলতে চাও তুমি?' শামিমের দিকে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠল হাসান। 'কি

ভেবেছ, অঁয়া? মিথ্যে কথা বলে এদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে?’

অকস্মাৎ হাসানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শামিম, ‘শালা বলে কি! নিশ্চয়ই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে...’

‘আমি বাঁচতে চাই!’ চিৎকার করছে হাসান ‘আমি ওদেরকে যা জানি সব বলে দেব...’

দু’জন এমন মারামারি শুরু করল, পারলে যেন খুন করে ফেলে।

এম.পি.-রা ওদেরকে ছাড়িয়ে দিল। শামিমকে মেশিন পিস্তল দিয়ে তিন-চারটে বাড়ি মারল একজন।

ছাড়া পেয়ে হাসান নিরাপদ দূরত্বে সরে যাচ্ছে, বলছে, ‘আমি স্বীকার করছি, আমাদের সঙ্গে আরও একজন ছিল। সে মারা গেছে।’

‘সত্যি কথা বলো, তা না হলে কিন্তু...’

‘আমি বাঁচতে চাই। সত্যি কথাই বলছি।’ হাসান গম্ভীর।

শ্যানন ফেকার চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ‘কিভাবে মারা গেল সে?’

‘পাহাড়ে ওঠার সময় নিচে পড়ে গিয়ে

‘পাহাড়ে কি করছিল সে?’

‘লুকাবার জন্যে উঠছিল।’ দ্রুত চিন্তা করছে হাসান। আলবিদা এখনও সম্ভবত হারবারে আছে। শাফি বা অন্যান্যদের কথা ফাঁস করা যাবে না। ‘মেইনল্যান্ড থেকে এখানে আসার প্ল্যান করে আমাদের লীডার। রশি ছুঁড়ে পাহাড় চূড়ায় আটকায়। অনেকটা উঠতেও পারে, তারপর পড়ে যায়। পাহাড়-প্রাচীরের নিচে খোঁজ নাও, লাশটা পেয়ে যাবে।’ একটু থেমে আবার বলল, ‘তারপর আমরা ধরা পড়ে যাই।’

‘ধরা তো পড়বেই,’ বলল মোসাদ এজেন্ট। ‘ওদিক দিয়ে আসাই তো বোকামি হয়েছে। পাহাড়ে ওঠার সময় প্রচুর শব্দ করেছে তোমরা। চেয়ার।’

চেয়ারটা সেল থেকে বের করে নিয়ে গেল একজন এম.পি. গার্ড। তার পিছু নিয়ে বাকি সবাইও বেরিয়ে গেল।

একটু পরই অন্ধকার হয়ে গেল সেল

শামিম আর হাসানকে দুর্গের ভিতরটা রেকি করতে পুঠিয়েছে রানা। সাগরের দিকটা, বিশেষ করে টাওয়ারটা নিজে দেখার ইচ্ছে ওর। ওরা চলে যাবার পর পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে ঝুলে থাকল, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতে চায় কিছু ঘটে কিনা

মেঘের ভেতর সঁধিয়ে গেল চাঁদ। আড়াআড়িভাবে একপাশে সরে আসতে শুরু করল রানা। একশো গজের মত এগিয়েছে, ওপর দিক থেকে কয়েক ধরনের আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমে একটা বেল বাজল, তারপর কমান্ডের আওয়াজ। জোড়া বুটের ভারী শব্দও ঢুকল কানে। শামিমের গলা পেল, ‘মার্চ!’

বুটের আওয়াজ থেমে গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই। তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না, খারাপ কিছু ঘটেছে। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে কখন গুলি হবে। তা অবশ্য হলো না।

গুলি হলো না, তবে খানিক পর প্যারাপিটের ওপর কালো আকাশ ফ্লাডলাইটের

আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আলো মানেই বিপদ, শামিম আর হাসান সম্ভবত ধরা পড়ে গেছে। ওপরে না উঠে নিচের দিকে নামতে শুরু করল রানা। ধীরে ধীরে একটা ঝুল-পাথরের নিচে এসে লুকিয়ে থাকল, মাথার ওপর প্যারাপিট, বাম দিকে টাওয়ার।

আরও খানিক পর ফ্লাডলাইট নিভে গেল।

যা ঘটান ঘটে গেছে। শামিম আর হাসানের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করে এখন কোন লাভ নেই। যা করার একাই করতে হবে ওকে।

গলা থেকে নামিয়ে জুতো পরল রানা, জুতোর ওপর মোজা পরল তারপর পকেট থেকে বের করল স্পাইক আর লেদার মোড়া হাতুড়ি। বাম দিকে যেতে হবে ওকে, টাওয়ারটা সেদিকেই, কিন্তু সরাসরি টাওয়ারের নিচে পৌঁছতে হলে পাহাড়ের গায়ে তৈরি একটা কোণ পার হতে হবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন মনে হওয়ায় ঝুল-পাথর বেয়ে ওপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল ও, ওটার ওপর ওঠার পর বাম দিকে যাবে।

নিজেকে রানা অর্ধৈ বা উত্তেজিত হতে দিচ্ছে না, কোন রকম তাড়াহুড়ো করছে না। স্পাইক গঁথে প্রথমে পরীক্ষা করছে শরীরের ভার সহ্য করতে পারবে কিনা, তারপর সেটায় হাত বা পা রাখছে। ঝুল-পাথরের মাথায় উঠতে অনেক সময় লেগে গেল। কিন্তু ওঠার পর হতাশায় ছেয়ে গেল মন—সামনে আরও চওড়া একটা ঝুল-পাথর পথ আগলে রেখেছে। এবার রানা উদ্বিগ্ন না হয়ে পারল না। ঝুল-পাথরটা এত চওড়া, এটাকে পাশ কাটানো সম্ভব নয়। দম ফিরে পাবার অপেক্ষায় ঝুলে থাকল ও, এই সময় একটা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। পরবর্তী স্পাইকটা গাঁথার জন্যে মাথার ওপরটা হাতড়াচ্ছে, কোন গর্ত বা খাঁজ দরকার। হাতে নরম কি যেন লাগল। এই তরল পদার্থই গন্ধটা ছড়াচ্ছে। হঠাৎ সমস্ত ক্রান্তি ও হতাশা দূর হয়ে গেল। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, ইসরায়েলিদের পয়গনিষ্কাশন ফ্যাসিলিটি ওর নাগালে চলে এসেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে গেল, এই স্যানিটেশন পদ্ধতি আরবদেরই আবিষ্কার, পরে ইউরোপীয়দের সভ্য করে তুলতে অবদান রাখে।

তরল আবর্জনা একটা গা খোলা চিমনির ভেতর দিয়ে নেমে আসছে। ওপরে ওঠার কাজে চিমনিটাকে ব্যবহার করল রানা, ওটার খাঁজে পা রেখে ওপরে উঠতে প্রায় কোন সমস্যাই হচ্ছে না।

এক সময় মাথার হেলমেট ঠুকে গেল পাথরে অর্থাৎ চিমনিটা এখানেই শেষ। এরপর শুরু হয়েছে ইঁটের গাঁথুনি। ভাগ্য ভাল, ইঁটের গা থেকে প্লাস্টার খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, সেখানে স্পাইক গাঁথতে কোন সমস্যা হলো না। মাথার ওপর টাওয়ারটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। পাথরের তৈরি পাঁচিল, অর্ধবৃত্তাকার। প্রায় চূড়ায় উঠে এল ও। কানের পাশে শো-শো করছে বাতাস। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আরেকটা আওয়াঙ শুনতে পাচ্ছে। বুট পরা পায়ের হাটাইটি। কেউ একজন পায়চারি করছে। বৃষ্টি ধরে এল, তারপর আবার শুরু হলো জোরে।

ধৈর্য ধরতে মন চাইছে না, জোরে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সাহসও বেড়ে গেছে। ওপরে পাহারা আছে জানে, তারপরও উঠতে শুরু করল আবার। প্যারাপিট টপকে এল ও, ব্যাটলমেন্টের ভেতর পাথুরে ডেক-এ দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের জুতো আর মোজা, ঘন ঘন নাড়াচাড়া করে আঙুলের আড়ষ্ট ভাব দূর করছে। আশপাশে কাউকে

দেখা যাচ্ছে না, বৃষ্টি শুরু হবার পর কোথাও মাথা গুঁজেছে সেদিকে।

এক প্রস্থ সিঁড়ি সহ টারিট ছাড়া টাওয়ারের মাথাটা সমতল। দরজাটা বাতাসের উল্টোদিকে। টারিটের মাথায় চিমনি রয়েছে, ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুতে দেখা গেল, আর আছে রেডিওর চারটে এঁরিয়াল।

ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে রানা, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠায় শরীরটা আর চলতে চাইছে না। বুটের ওপর মোজা পরায় পাথুরে মেঝেতে কোন শব্দ হলো না। টারিটের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিচ্ছে। দরজার ভেতর থেকে একজন লোক কাশল। কী-হোল থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। সেদিকে সম্ভবত একা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকল রানা। এক সময় বৃষ্টি ধরে এল।

তালা খোলার আওয়াজ হলো। ফাঁক হলো দরজার কবাট। কি ঘটল বোঝার আগেই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে জ্ঞান হারাল সেদিকে। লাশের গায়ে ছুরির ফলা, মুছল রানা। হাতে চলে এল লোকটার উজি আর একজোড়া স্পায়ার ক্রিপ পকেট হাতড়ে পেল পেল শুধু। লাশটা টেনে এনে টাওয়ারের কিনার থেকে ফেলে দিল নিচে।

বুট থেকে মোজা খুলল রানা। বৃষ্টির পানিতে ওর ইউনিফর্মের বেশিরভাগ ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে গেছে। তালুর চামড়া ছড়ে গেছে, উজিটা চেক করার সময় ব্যথা পেল। চৌকাঠ পেরিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে নিঃশব্দে বন্ধ করল, সাবধানে নেমে যাচ্ছে প্যাচানো সিঁড়ি বেয়ে।

চোদ্দটা ধাপ নামার পর খিলান আকৃতির একটা দরজা দেখা গেল। লোহার গেটে লেখা রয়েছে—গার্ডরুম। সেটাকে পাশ কাটিয়ে আরও কয়েকটা ধাপ নামল রানা। আরও একটা দরজা। এটার গায়েও কার্ডবোর্ড লটকাচ্ছে, লেখা—রেডিও রুম। ভেতর থেকে লোকজনের গলা ভেসে আসছে। আরও নিচ থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে আসছে, চিৎকার করে কথা বলছে লোকজন, হাঁটাচলা করছে।

সত্যি যদি দুপুর একটায় রওনা হয় সাবমেরিন, ধরে নিতে হয় শেষ মুহূর্তের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে সবাই। গম্ভীর হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। খানিকটা বুদ্ধি খাটিয়ে এই ব্যস্ততাকে গোলযোগে রূপান্তরিত করতে পারে ও, তারপর সেই গোলযোগের সুযোগ নিতে পারে।

সিঁড়ির শেষ বাঁকটা ঘুরল ও। ধাপ বেয়ে নেমে এল নিচে। ওর সামনে একটা করিডর। করিডরের এক দিকে পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা, আরেকদিকে শুধুই জানালা। জানালার বাইরে অন্ধকার উঠান। করিডরে আলো খুব কম, মাত্র একটা বালব হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে একজন সেদিকের মাপা পদক্ষেপ অনুকরণ করে হাঁটছে রানা। প্রতিটি দরজায় কার্ডবোর্ড, সেগুলোয় লেখা—নেভী অফিস, ডক অফিস, স্টোরস ইত্যাদি। ভেতরে কাগজের স্তুপ, হুমড়ি খেয়ে রয়েছে লোকজন, সিগারেট ফুকছে, কথা বলছে টেলিফোনে, ল্যাম্পের আলোয় খসখস করে কি সব লিখছে।

দু'জন সৈনিক, ম্লান চেহারা, বগলে ফাইল, পাশ কাটাল ওকে। একজন নাক সিটকে বলল, 'কিসের গন্ধ রে বাবা!' চেহারা নির্লিপ্ত করে রাখল রানা। চলে গেল তারা।

করিডরের মাথায় আরেকটা সিঁড়ি। কোথায় যাচ্ছে রানা জানে না। কি খুঁজছে তাও পরিষ্কার নয়। যে-কোন একটা সুযোগ বা সূত্র পেলেই চলে ওর। পরবর্তী ইতিকর্তব্য স্থির করতে এক পলকও লাগবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষের দুর্গের ভেতর একা ঘোরাঘুরি করার সময় সূত্র বা সুযোগ পাওয়া সহজ নয়। এখনও যে ধরা পড়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্য।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে দেখে ওপরে উঠছে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপটেন। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে হেলমেটে হাত ঠেকিয়ে স্যাঁলুট করল রানা। ক্যাপটেন ওর দিকে না তাকিয়েই ক্যাপ স্পর্শ করল, চলে গেল পাশ কাটিয়ে। ইউনিফর্ম দেখে কোন সন্দেহ করেনি। রানা ভাবল, ব্যাটার নিশ্চয়ই সর্দি হয়েছে, তা না হলে গন্ধটা ঠিকই পেত। কিংবা হয়তো গন্ধটা পাচ্ছে বলেই সবাই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

দামী তামাকের গন্ধ ঢুকল নাকে। সুযোগ যদি নাও হয়, এটা অবশ্যই একটা সূত্র। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে খুব দামী হাভানা চুরুটের গন্ধ। নিঃশব্দ পায়ে গন্ধ অনুসরণ করল রানা, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে।

সিঁড়ির নিচে আরেকটা করিডর, হুবহু প্রথমটার মত, পার্থক্য শুধু করিডরের মাঝখানে একটা দরজা। কালো ওক কাঠের কবাট, লোহার কজাগুলো জলপাই শাখার আদলে নকশা করা। শুধু যে দেখতে সুন্দর, তা নয়, এই দরজা বুলেট ঠেকাবার কাজেও উপযোগী। রানা ধারণা করল, ভেতরের কামরা থেকে হারবার দেখা যায়। এটা নিশ্চয়ই কমান্ড্যান্ট-এর অফিস কামরা। হাভানা চুরুটের সুগন্ধ এখানে আরও কড়া।

দরজার দিকে এগোচ্ছে রানা, হঠাৎ খুলে গেল কবাট দুটো। নৌ-বাহিনীর একজন অফিসার বেরুল, একবার মাত্র তাকাল রানার দিকে, দরজাটা ঠেলে দিয়ে করিডর ধরে এগোচ্ছে—চেহারায বাস্তব ভাব, হাতে এক গাদা কাগজ-পত্র। কামরার ভেতর থেকে কয়েকটা শব্দ যেন তাড়া করল লোকটাকে, 'মনে থাকে যেন, এক ঘণ্টার মধ্যে!' আওয়াজটার মধ্যে এমন কিছু আছে, রানার সন্দেহ হলো গলায় ঘা থাকতে পারে, কিংবা হয়তো ঠাণ্ডায় বসে গেছে।

'ইয়েস জেনারেল!' এডিসি বিভ্রিড় করল, নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে কবাট ঠেলে ফাঁক করল রানা, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আট

সামনে করিডর, শেষ মাথায় খিলান আকৃতির জানালার বাইরে গাড়ি অন্ধকার। মার্বেল পাথরের মেঝে বেশিরভাগটাই মরোক্কান কার্পেটে ঢাকা। ভেতরের বাতাস গরম, চুরুটের গন্ধ ভুরভুর করছে। আলো আসছে বিশাল এক ঝাড়বাতি থেকে। একদিকের দেয়ালে নাম করা শিল্পীদের তৈলচিত্র। করিডরের দু'দিকে দুটো করে চারটে দরজা। তিন জোড়া কবাট বন্ধ। একজোড়া খোলা।

কামরাটা বিশাল, চল্লিশ ফুট লম্বা। এক সেট সোফা, দুটো আর্মচেয়ার, একটা টেবিল। বড় আকৃতির ফায়ারপ্লেস। শেষ মাথায় খিলান আকৃতির জানালা। জানালার সামনে ডেস্ক, তাতে একজোড়া টেলিফোন, ইন্টারকম, বেল, অ্যাশট্রে ইত্যাদি। ওই অ্যাশট্রে থেকেই চুরুটের ধোঁয়া উঠছে। ডেস্কের পিছনে বসা ব্যক্তির মাথা খানিকটা ছুঁচাল, শুধু মাঝখানে টাক, টাকের চারপাশে আধ-পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা।

কামরায় কোন সেক্সি নেই দেখে একটু অবাক হলো রানা। তারপর ভাবল, দুর্গে কেউ যদি ঢুকতেই না পারে, সেক্সি থাকার দরকারই বা কি? লজিক ঠিক আছে।

কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ডেস্কের পিছনে বসা সামরিক অফিসার মুখ তুলে তাকালেন না। ইউনিফর্মে আটকানো ইন্সিগনিয়াগুলো বলে দিচ্ছে, তিনি একজন পুরোদস্তুর জেনারেল। ডেস্কে ফোলে রাখা ক্যাপটাও তাই বলে সরু আঙুলগুলো অ্যাশট্রের দিকে এগোল। দাঁত দিয়ে চুরুট আটকে ধোঁয়া গিললেন, তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এতক্ষণে চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন।

পানি রঙা চোখ, চোয়ালের উঁচু ও ফুলে থাকা হাড়ের ওপর বসানো মুখে মাংস নেই বললেই চলে, চিবুক ছুঁচাল গলায় নড়ে উঠল কণ্ঠা। কণ্ঠায় কোন সমস্যা আছে। বাম দিকে একটা গর্ত—ওকনো ক্ষতের চিহ্ন। গর্তটার ভেতর আঙুলের অর্ধেকটা ঢুকে যেতে পারে। ‘কি?’ প্রশ্ন করলেন জেনারেল। কর্কশ, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। চুরুটটা বাম হাত থেকে ডান হাতে নিলেন। রানা লক্ষ করল, ডান হাতটা কৃত্রিম, শক্ত রাবার দিয়ে তৈরি।

নিহত সেক্সির পেরুকটা পকেট থেকে বের করে সামনে বাড়াল রানা, বাড়িয়ে ধরল জেনারেলের দিকে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাত ঝাপটা দিয়ে সেটা সরিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত দিলেন জেনারেল, হঠাৎ দুর্গন্ধ পেয়ে নাক কোঁচকালেন। প্রাইভেট সোলজার নর্দমায় গড়াগড়ি খেয়ে নিজের পরিচয় দেয়ার জন্যে জেনারেলের কামরায় ঢোকে না। এই পেরুকটা এখানে কি মনে করে ঢুকেছে? রাবারের আঙুল বেল বাজাবার জন্যে বোতামের ওপর স্থির হলো।

মুখে বোকা বোকা হাসি ফুটিয়ে জেনারেলের হাতটা বোতামের ওপর থেকে ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিল রানা। ওর দিকে এবার বিষ্ময় মেশানো কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন জেনারেল। গলার দু’দিকে রশির মত মোটা দুটো রং ফুলে উঠল পেরুকটার দিকে তাকালেন না, চিৎকার করতে যাচ্ছেন।

পেরুক ধরা হাতটা জেনারেলের দিকে আরও এগোচ্ছে জেনারেল সেটাকে গ্রাহ্য করছেন না। তিনি রানার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। রাগ তো হচ্ছেই, তারচেয়ে বেশি বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, সেই সঙ্গে অজানা একটা ভয়ও জাগছে মনের কানাচে। পেরুকটা থামল না, বরং হঠাৎ সেটা তীব্র আঘাত করল জেনারেলের কণ্ঠায়। প্রায় একই সঙ্গে অপর হাত দিয়ে জেনারেলের নাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা।

চেয়ার সহ কার্পেটের ওপর পড়ে পেলেন জেনারেল। ডেস্ক টপকে তাঁর বুকের ওপর পড়ল রানা। ধস্তাধস্তি না করে স্থির হয়ে থাকলেন জেনারেল, কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন, ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?’

‘এই দুর্গে সম্ভবত একা আমিই পাগল নই, বলল রানা।’

‘তুমি...তুমি ইসরায়েলি সেনা নও.’ বললেন জেনারেল।
‘না।’

জেনারেলের জন্যে অসম্মানজনক হয়ে যাচ্ছে, কথাটা মনে হতেই তাঁর বুক থেকে নেমে পড়ল রানা, হোলস্টার থেকে হাতে বেরিয়ে এল মেশিন পিস্তলটা।

জেনারেলের গলায় দ্রুত ওঠা-নামা করছে কণ্ঠটা। ‘তুমি আমাকে গুলি করলে করতে পারো, কিন্তু ট্রিগার থেকে আঙুল সরাবার আগেই দশজন সশস্ত্র লোক ভেতরে ঢুকে পড়বে। তখন কি করবে?’

‘আমার নয়, নিজের কথা ভাবুন, জেনারেল,’ বলল রানা। ‘আমার কথা শুনলে আপনাকে মরতে হবে না।’

জেনারেল হাসলেন। রানার অনুমতি না চেয়েই কার্পেটের ওপর উঠে বসলেন একটু পিছিয়ে এল রানা। ‘যদি বলি, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম?’

‘চালাকি হচ্ছে, না?’ বলল রানা। ‘ব্যাখ্যা করুন।’

‘ইসরায়েলি জেনারেল প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয়, বললেন জেনারেল ‘তুমি উত্তরটা না পেয়েই মারা যাবে।’

হাই তুলল রানা। ‘মাফ করবেন, বলল। তারপর জানতে চাইল, ‘ওরা কোথায়? আমার দু’জন লোককে আপনারা আটকে রেখেছেন।’

জেনারেলের মুখের পেশীতে ঢিল পড়ল। রানা ওর একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। এবারও অনুমতির ধার না ধরে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, দাঁড়াবার সময় খাড়া করলেন চেয়ারটা, তারপর বসলেনও তাতে—তবে ডেস্কের দিকে নয়, রানার দিকে মুখ করে। ‘ওরা যেখানে আছে সেখানে তোমাকেও পাঠানো হবে,’ বললেন তিনি। চেয়ারের পাশে আধ হাত দূরে বেলের বোতাম। ‘কেন এসেছ তোমরা? কি করতে চেয়েছিলে?’

‘এটা,’ বলেই মেশিন পিস্তলের ব্যারেলটা দিয়ে জেনারেলের অক্ষত হাতের কনুইয়ে বাড়ি মারল রানা।

হাতটা বৃকে টেনে নিলেন জেনারেল, ব্যথায় নীল হয়ে গেল চেহারা। কনুইয়ের হাড় নির্যাত ভেঙে গেছে। ‘এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে। মরার আগে এমন কষ্ট পাবে...’

‘প্রশ্নের জবাব দিতে শিখুন। আমার সঙ্গীরা কোথায়?’

ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন জেনারেল। বসে থাকতে পারলেন না, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সামান্য টলছেন। চিৎকার করে কাউকে ডাকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরুবে না বলে ভয় পাচ্ছেন। ইচ্ছে হচ্ছে বেলের বোতামটায় চাপ দেন, কিন্তু আরেকটা হাড় ভাঙার ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছেন না। এডিসি ফিরবে এক ঘণ্টা পর। তার আগে আর কেউ কি কোন কাজে তাঁর কাছে আসবে? তিনি জানেন না। এতসব কথা ভাবছেন রানার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। চেহারাটা তিনি চেনেন। ‘তুমি ইরাকী নও! অথচ আমরা জানি ইরাকী ইন্টেলিজেন্স-এর একদল লোক স্যাবোটাজ করতে আসছে। তুমি তাহলে কে?’

রানা কিছু বলল না

‘এত সাহস...প্যারাসুট নিয়ে ইসরায়েলে নামো...মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, সেনাবাহিনী, মোসাড-এদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ো আমাদের সুরক্ষিত একটা ঘাঁটিতে...কে তুমি?’

রানা তবু কিছু বলছে না।

কি যেন মনে করতে চাইছেন জেনারেল। কোন একটা ফাইলে এই লোকের ফটো দেখেছেন তিনি। সত্যি দেখেছেন? দেখে থাকলে নামটা মনে পড়ছে না কেন? ‘তুমি...তুমি কি মাসুদ রানা? বিসিআই এজেন্ট? মোসাডের এক নম্বর শত্রু?’

‘আমার সঙ্গীরা কোথায়?’ রানার সেই একই প্রশ্ন।

‘তোমরা তিনজন একসঙ্গে মারা যাবে,’ জবাব দিলেন জেনারেল।

মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা। শামিম আর হাসান এখনও বেঁচে আছে। ‘প্লীজ, জেনারেল, ইউনিফর্ম খুলে ফেলুন। তাড়াতাড়ি।’

‘না,’ বলেই হাত লম্বা করলেন জেনারেল, বোতামটায় চাপ দেবেন।

সাপের মত ছোবল মারল মেশিন পিস্তলের ব্যারেল, হাড়ের মত সাদা জেনারেলের টাক চুরমার হয়ে গেল চোখ উল্টে গেল, দ্বিতীয় বার চেয়ার সহ পড়ে গেলেন কার্পেটে, তারপর আর নড়লেন না।

ডেস্ক মেশিন পিস্তল রেখে চুরুটটা অ্যাশট্রেতে নেভাল রানা। তারপর দরজার সামনে চলে এসে বোল্ট লাগাল। ফিরে এসে পালস দেখল। জেনারেল মারা গেছেন।

ইউনিফর্ম আর বুট খুলে দ্রুত পরে নিল রানা। পরিত্যক্ত ইউনিফর্ম এখনও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখল সেটা। জেনারেলের ইউনিফর্ম ওর গায়ে পুরোপুরি ফিট করেনি, তবে এত আঁটসাঁট নয় যে দষ্টিকটু বলা যাবে। যতটা সম্ভব ছায়ার ভেতর থাকতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল।

ডেস্ক থেকে ক্যাপটা নিয়ে মাথায় পরল রানা, কামরাটা ঘুরেফিরে দেখছে। একটা দরজা খুলতে ভেতরে টেবিলের ওপর শর্ট-ওয়েভ রেডিও দেখা গেল। বাথরুমে ঢুকে হাত ধুলো ও। রেজার-এর ব্রেড বদলে দাড়ি কামাতে শুরু করল। ভাবছে। প্যারাসুট নিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে আলো জ্বলে উঠেছিল। দুর্গে ওঠার পরপরই ধরা পড়ে গেছে শামিম আর হাসান জেনারেল বলে গেলেন, তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

দাড়ি কামিয়ে রেডিও রুমে ফিরে এল, সামান্য ঝোঁড়াচ্ছে-বুট জোড়া ওর পায়ের তুলনায় একটু ছোট। রেডিও অন করে আলবিদার ফ্রিকোয়েন্সিতে ডায়াল ঘোরাল। ‘ইস্রাফিল,’ পাস কোড উচ্চারণ করল শুধু।

যান্ত্রিক গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তারপর ক্ষীণ একটা কণ্ঠ ভেসে এল, ‘আফলাতুন!’ যান্ত্রিক গুঞ্জন সত্ত্বেও নাসেরের গলা চিনতে পারা গেল।

রানা বলল, ‘মেইন গেটে প্রচুর এক্সপ্রোসিভ বসিয়ে রেখেছি। যোগাযোগ করা হয়েছে তিনদিক থেকে। রিইনফোর্সমেন্ট আশা করছি।’

‘হোয়াট!’ নাসের হতভম্ব।

প্রেস-ট-টক সুইচ অন করল রানা। ‘যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন,’ বলল ও। ‘পরবর্তী সমস্ত রেডিও কমিউনিকেশন ভুয়া বলে ধরে নেবেন। মেইন ফোর্স-এর

আসার অপেক্ষায় থাকবেন—এক ঘণ্টা। অ্যাকনলেজ।' সুইচ থেকে আঙুল তুলে নিল।

নাসের সাড়া দিচ্ছে না। হয় ওর নির্দেশ সে বুঝতে পারেনি, তা না হলে হতভয় ভাবটা কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে, কিংবা এ স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ।

'অ্যাকনলেজ,' আবার বলল রানা।

'আই অ্যাকনলেজ,' এবার জবাব দিল নাসের।

অফিস কামরায় ফিরে এল রানা। খুব সাবধানে বোল্ট খুলল দরজার। ফিরে এসে জেনারেলের লাশটা লুকিয়ে রাখল পর্দার আড়ালে। ডেস্কের ওপর চুরুটের বাস্ক রয়েছে, একটা চুরুট নিয়ে ধরাল, তারপর জানালার সামনে এসে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

জানালার বাইরেটা অন্ধকার। পাঁচ মিনিট কাটল। হঠাৎ করে বাম দিকের আলো আরও সাদা হয়ে উঠল, যেন অনেকগুলো বালব জ্বলে উঠেছে। ডেস্কের একটা বোতামে চাপ দিয়ে আবার জানালার সামনে চলে এল রানা। ওর পিছনে খুলে গেল দরজা। একটা গলা পেল ও। 'জেনারেল?'

জানালার কাঁচে তরুণ এক অফিসারের প্রতিচ্ছবি, আড়ষ্টভঙ্গিতে অ্যাটেনশন হয়ে আছে। জেনারেলের বিকৃত গলা যতটুকু সম্ভব অনুকরণ করে রানা বলল, 'গেটে কোন সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা কি?'

'শত্রুর তৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, জেনারেল।'

'মানে?'

'ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট, জেনারেল। বিস্তারিত আমাদের কিছু জানানো হয়নি।'

রানা বলল, 'ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করো। তুমি নিজে। কি ঘটছে সব জানার পরই শুধু ফিরে আসবে। কোন সমস্যা হয়ে থাকলে আমাদের যেন জানানো হয় সেটার সমাধান করা হয়েছে। গোটা ফোর্স নিজের কর্তৃত্বে নাও। প্রয়োজন হলে, গোটা গ্যারিসন।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন...ভোরে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি...'

রানার মনে হলো ওর হার্টবিট থেমে গেছে। 'সময়টা বলো। কখন?'

'ভোরে, জেনারেল,' তরুণ অফিসার বলল, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'স্যারের নিশ্চয়ই মনে আছে...স্যারই নির্দেশটা দিয়েছিলেন...'

'ভোরের কোন সময়, ইডিয়ট!' ধমক দিল রানা।

'জী, আচ্ছা, বুঝেছি,' অফিসার তোতলাতে শুরু করল। 'মাপ করবেন, স্যার। ও-ফাইভ-ও-ও, জেনারেল।'

'কাজেই জেনারেল অ্যালার্ম বাজাবে তুমি, বলল রানা। তারপর গেটের দিকে প্রসিড করবে।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল...'

'সাইলেন্স!' গর্জে উঠল রানা। 'শুধু সেন্সিটাইভদের রেখে যাও, আর মাত্র একজন লোক বন্দীদের ইন্টারোগেশন করবে আমি। আমার এসকর্ট দরকার হবে। বাকি সবাই গেটে থাকবে। নির্দেশ মত কাজ না হলে ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে আমি দায়ী

করব।

‘কিন্তু...’

‘উপায় নেই, বৃষ্টির মধ্যেই বেরুতে হবে তোমাকে,’ বলল রানা। ‘এবং শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। আমার কাছে খবর আছে, ওরা রিইনফোর্সমেন্ট সহ আছে—শুধু ইরাকী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট নয়, সঙ্গে বিসিআই এজেন্ট আছে। শান্তি মিশন নিয়ে আসছে ওরা।’

বুট ঠুকে স্যালুট করল তরুণ অফিসার। ‘ইয়েস, স্যার,’ আড়ষ্ট, আহত কণ্ঠে বলল। তার দৃষ্টি পথ ঢেকে রেখেছে জেনারেলের ইউনিফর্ম।

‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসকট পাঠাও,’ বলল রানা। ‘ডিসমিস।’

আবার বুট ঠোকার আওয়াজ শুনল রানা। দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরই অ্যালার্ম বেল বাজতে শুরু করল, বিরতিহীন। ঘুরল রানা, নতুন আরেকটা চুরুট ধরাল।

পাঁচটায়। সাবমেরিনগুলো আট ঘণ্টা আগে রওনা হচ্ছে। অথচ শান্তি মিশনের সদস্যরা ওগুলোকে এখনও চোখের দেখাও দেখেনি, কাজ শুরু করা তো দূরের কথা।

বাইরের করিডরে অনেক বুটের আওয়াজ, অফিস রুম কাঁপিয়ে দিল জেনারেলের স্টাফ ওরা, নির্দেশ পেয়ে গেটের দিকে ছুটছে। বুটের ভারী আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। দু’বার নক হলো দরজায়। জানালার দিকে ফিরল রানা। ‘এসো!’ ধমকের সুর।

নার্ভাস একটা কণ্ঠস্বর, ‘স্যার, জেনারেল!’

‘বন্দীদের জেরা করব আমি,’ বলল রানা। ‘পথ দেখাও।’

‘পথ দেখাব, স্যার?’

‘সামনে থাকা,’ রানার সুর কঠিন। ‘আমি অনুসরণ করব। অ্যাবাউট টার্ন!’

আধ পাক ঘুরল সৈনিক। ঘুরল রানাও, হাতদুটো গিহনে এক করা। করিডরে বেরিয়ে এসে চিবুকটা কলারে ডুবিয়ে রাখল ও, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অনুসরণ করছে প্রাইভেটকে। কেউ যদি দেখে এখন, দেখবে জেনারেলের ক্যাপ চোখের ওপর নেমে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, রাউন্ড দিতে বেরিয়েছেন। তবে দেখার মত কেউ নেই, কেরানীরা ছাড়া। অ্যালার্মের আওয়াজ শুনে অ্যাসেম্বলি পয়েন্টে চলে গেছে সবাই। ওখান থেকে তরুণ অফিসারের নির্দেশে পেনিনসুলার র‍্যামপার্ট-এ পজিশন নেবে তারা।

এসকটের বুট সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে রানার, এরইমধ্যে ফোঁকা পড়ে গেছে পায়ের চামড়ায়।

আলবিদায় ভূয়া মেসেজ পাঠিয়েছে ও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই মেসেজ পৌঁছে গেছে অস্থায়ী গ্যারিসনে।

আলবিদায় কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।

লায়লা দীর্ঘ একটা সময় ইসরায়েলের ভেতর ছিল, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। মোসাদ এজেন্ট আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কয়েকবার তাকে জেরা করেছে। সে যদি দলবদল করে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই নাসেরকেও রানা

পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। লায়লাকে ইসরায়েলিরা বারবার ধরার পরও ছেড়ে দিয়েছে, তার স্বামী ওদের পক্ষে তথ্য পাচারের কাজ করছে বলেই কি? তারপর শাফির কথাও ভাবল রানা। ইসরায়েল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তার জানা। নিয়মিত স্বাগলিং করত তাকে দিয়ে কাজ করানো ইসরায়েলিদের জন্যে সহজ। সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই বাদ দেয়া যায় না।

তবে এখন এসব নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে।

সোলজার দাঁড়িয়ে পড়ল। 'জেনারেল।'

লম্বা একটা করিডরে রয়েছে ওরা, দু'পাশে ইস্পাতের দরজা। সিলিং থেকে সাদা আলো আসছে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গুমোট, ভ্যাপসা একটা গন্ধ বাতাসে কাঙ্ক্ষাকাঙ্ক্ষি দরজার পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ানো সেন্টি খুক করে একবার কাশল রানা বলল, 'চাবি।'

আবার কাশল সেন্টি।

'চাবি!' ধমক দিল রানা, হাত পাতল।

'ইয়েস, স্যার!' বলে বেল্ট হাতড়াতে শুরু করে রানার হাতের দিকে তাকাল সেন্টি।

রানার গায়ের চামড়া অকস্মাৎ বরফ হয়ে গেল। ওর বাঁড়ানো হাতের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সেন্টি। ডান হাত ওটা। রক্ত-মাংসের অকৃত্রিম হাত। অথচ জেনারেলের ডান হাত বাদামী রাবার দিয়ে তৈরি। 'স্যার, জেনারেল,' বলল সেন্টি, মুখের ভাব দেখে সন্দেহ হলো এখুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। 'আপনার হাত...আপনি জেনারেল নন!'

'চাবি,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। ক্যাপের কিনারা থেকে দেখতে পেল লোকটার হাত মেশিন পিস্তলের দিকে এগোচ্ছে।

সেলটা আগের মতই অন্ধকার। ঠাণ্ডা আর দুর্গন্ধ আগের চেয়ে বেড়েছে যেন। পকেট হাতড়ে সিগারেট পেল হাসান, শামিমকে একটা দিল। প্রায় দু'ঘণ্টা পর প্রথম কথা বলল শামিম, 'ক'টা বাজল বলো তো?'

হাসান বুঝতে পারল, অপারেশনের কথা এখনও ভুলতে পারছে না শামিম। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রেখে বলল, 'বারোটা পাঁচ।'

'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটবে।'

আরও ত্রিশ সেকেন্ড নিঃশব্দে কাটল। কিছুই ঘটল না। তারপর সেলের বাইরে অকস্মাৎ মেশিন পিস্তল গর্জে উঠল। তিন সেকেন্ড পর দাতন শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। অন্ধকারে বিক্ষোভিত হলো উজ্জ্বল আলো। আলোর সামনে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে। পা দুটো যথেষ্ট ফাঁক করা, গায়ে আঁটসাঁট ইউনিফর্ম, হাত দুটো কোমরে। শামিম আর হাসান নিঃশব্দে হাসতে শুরু করল। ওরা ওদের হিরোকে চিনতে পেরেছে।

রানার গলা শুনতে পেল ওরা, 'আমি ভাবলাম এখানে থাকতে তোমাদের ভাল লাগছে না, তাই নিতে এলাম।'

মুহূর্তে নীরবতা। শুধু করিডর থেকে চাপা গোড়ানির আওয়াজ ভেসে আসছে

শামিম বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারলে তোমার সঙ্গে নরকে যেতেও আমার আপত্তি নেই।'

হাসান বলল, 'ইউনিফর্মটা গায়ে ফিট করেনি।'

'কি আর করা, ব্যাটা আমার চেয়ে রোগা ছিল,' হাসি চেপে বলল রানা। বেরিয়ে এল করিডরে। মেঝেতে দু'জন লোক পড়ে আছে। 'ওদের ইউনিফর্ম পরে নাও, পকেট থেকে বের করো প্লেবুক,' নির্দেশ দিল ও। লোক দু'জনকে টেনে সেলে ঢোকাল শামিম। বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা।

'এখন কি করব আমরা?' জানতে চাইল হাসান।

'তোমাদের কি দরকার তাই বোলো।'

হাসান তার বিস্ফোরক ফেরত পেতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো পাবে না। 'যা পাব তাই দিয়েই কাজ সারতে হবে,' বলল সে। 'এখানে সাবমেরিন থাকলে মিসাইল আর টর্পেডোও আছে। টর্পেডোর সাহায্যে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো যায়। আমি ম্যাগাজিনটা দেখতে পেলো খুশি হতাম।'

শামিম কিছু বলল না, শুধু মাথা ঝাঁকাল।

পাঁচ মিনিট পর জেনারেল দু'জন এসকর্টকে নিয়ে মেইন গেট পেরুল। এসকর্টদের একজন যেমন লম্বা তেমন চওড়া, আরেকজন লম্বা ও একহারা, দু'জনেই আড়ষ্টভঙ্গিতে যে যার মেশিন পিস্তল বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ধরে আছে। গেটের সেকিউরা স্যালুট করল। জেনারেল স্যালুটের জবাব দিলেন বাম হাতে; কৃত্রিম ডান হাত শরীরের পাশে সেঁটে আছে।

পরিখার ওপর ব্রিজটা পেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘুরল ওরা, প্রশস্ত এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে। চারদিকে আরও লোকজন দেখা যাচ্ছে। হারবারের আকাশ ওয়েল্ডিং টর্চের নীলচে আলোয় ঝলসে উঠছে মাঝে মাঝে। সিঁড়ির নিচে, হেডল্যান্ডের কাঁধে, গভীর একটা গর্তের মত জায়গাটা। গর্তের মাঝখানে ভোঁতা চেহারার একটা কংক্রিট বাস্কার, কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

কোথাও থেকে ট্রাক এঞ্জিনের ভারী আওয়াজ ভেসে আসছে। লোহার ওপর হাতুড়ি ঠোকার শব্দও পাচ্ছে ওরা। একটা ট্রাক দেখা গেল, লোকজন ভর্তি। অস্থায়ী গ্যারিসন খালি করে চলে যাচ্ছে সবাই। কিন্তু মেইন গেটে এখনও সশস্ত্র লোকজন রয়েছে।

বাস্কার এরিয়ায় ঢুকতে হলে একটা গেট পেরুতে হবে। সেদিকে এগোল রানা কাছাকাছি এসে দেখা গেল, ঠিক বাস্কার নয়, পাঁচিল ঘেরা একটা সুরক্ষিত জায়গা, ফুলে থাকা জমিনের ওপর তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশপথে ইস্পাতের দরজা। এটাই ম্যাগাজিনে ঢোকার পথ।

গেটে দাঁড়ানো সৈনিক নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে। 'পাস?'

জেনারেলের কর্কশ গলা অনুকরণ করল রানা, 'গেট খোলো।'

'কিন্তু, স্যার, জেনারেল...'

'নিয়ম রক্ষার জন্যে জেনারেলকে চ্যালেঞ্জ করা, ভেরি গুড, বলল রানা। 'তোমার তো পদোন্নতি হওয়া উচিত। কিন্তু আশ্চর্য, কাল রাতে তোমার ফাইলে যে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট দেখলাম, তাতে তো তোমার কোর্ট মার্শাল করার সুপারিশ করা

হয়েছে—নানা ধরনের অনাচার আর কর্তব্যে গাফলতির জন্যে। ব্যাপারটা কি?’

‘আমার ফাইল...জেনারেল...’

‘এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তুমি পরে দেখা করো। এখন কি দরজাটা খুলবে?’

গেট খুলে দিল সেস্টি, ভেতরে ঢুকল ওরা। সেস্টি নিশ্চয়ই কোন বোতামে চাপ দিয়েছে, কারণ ইস্পাতের দরজা হাইড্রুলিক-এর আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনে। সামনে এক প্রস্থ পাঁচচানো সিঁড়ি, সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায়, একপাশে একটা হয়েস্ট বা লিফট, ওটার সাহায্যেই দুর্গের মেশিনগানে অ্যামিউনিশন পাঠানো হয়। সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। ম্লান চেহারা, নির্লিপ্ত, ক্লান্ত ও বটে, তবে ক্লান্তির সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছে উদ্বেজনা। ইস্পাতের দরজা বন্ধ হওয়াটাই কারণ

ওরা এখন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখানে কোন বালির বস্তা নেই যে লুকানো যাবে। গা ঢাকা দেয়ার মত কোন ছায়াও নেই। পাঁচশো শত্রুসৈন্যের চোখকে ধুলো দেয়ার জন্যে একমাত্র সম্ভব ইউনিফর্ম আর ইনসিগনিয়া। রানা শুধু একা নয়, শামিম আর হাসানও এই মুহূর্তে নিজেদেরকে খুঁদে ও দুর্বল রক্ত মাংসের মেশিন বলে ভাবছে। সঙ্গে অস্ত্র আছে, কিন্তু পাঁচশো সৈন্যের বিরুদ্ধে তা কি কাজেই বা লাগবে? ওই অস্ত্র আর খালি হাত দিয়ে ইস্পাতের তৈরি তিনটে প্রকাণ্ড মেশিন ধ্বংস করতে হবে ওদেরকে। অনুভূতিটা ভীতিকর, নিজেদের নগ্ন ও অসহায় লাগছে, যেন একটা দুঃস্থপুত্র ভেতর ঘটছে সবকিছু।

কিন্তু এ নির্জলা বাস্তব। নিজেদেরকে এই বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। রানা ভাবছে, এই সিঁড়ির নিচে টুলস আছে, সেগুলো দিয়ে ওদেরকে কাজ সারতে হবে। হাসানকে পৌছে দিতে হবে বিস্ফোরকের কাছে। হাসানের ওপর আস্থা রাখা যায়, বিস্ফোরক পেলে খালি হাতেই পাঁচশো সৈন্যকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারে সে। নিজেকে অভয় দিল রানা, সব ভালভাবেই সমাধা করা যাবে

পাঁচচানো সিঁড়ি একটা টানেলে নেমে এসেছে, পাহাড়ের নিচে একটা গহবরে। সেলগুলো নাহয় হয়েস্ট-এর সাহায্যে বহন করা সম্ভব, কিন্তু মিসাইল আর টর্পেডো? ওগুলো আকারে বড়, ওজনও খুব বেশি, স্থানান্তর করতে হয় লম্বালম্বিভাবে, খাড়া করে সম্ভব নয়। ম্যাগাজিনের মেঝে সাবমেরিন ভেড়ার প্র্যাটফর্মের মোঝের সঙ্গে একই লেভেলে থাকতে হবে।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ফ্যাশপ্রফ দরজা। ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলল হাসান। ম্যাগাজিনে ঢুকল ওরা। ছাই রঙের বিশাল এক কংক্রিট কমপার্টমেন্টে, ওদের সামনে থেকে বহু দূর বিস্তৃত, সাদা বাল্কহেড লাইটের আলোয় দিনের মত আলোকিত হয়ে আছে। শেল রাখা হয়েছে কন্টেইনারে। চাকা লাগানো বিশাল আকৃতির ট্রলির জন্যে একটা জায়গা আলাদা করা, এগুলোতে করেই ডকে নিয়ে যাওয়া হয় মিসাইল ও টর্পেডো, সাবমেরিনে ভোলার জন্যে

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। তিনটে পঁয়তাল্লিশ ও অগ্নিহ!

তিনজনই ওরা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, চারদিকে চোখ বুলানো শেষ করে ম্যাগাজিন-এর সেন্ট্রাল আইল-এর দিকে তাকাল। ওখানেই সাবমেরিন ধ্বংস করার উপকরণগুলো থাকার কথা। কিন্তু সমস্যা হলো শেল রাখার কন্টেইনার আর টর্পেডো ও মিসাইল রাখার ট্রলিগুলো, সব মিলিয়ে পাঁচশোর কম নয়, একদম খালি

পড়ে আছে। কয়েকজন লোক একটা ইলেকট্রিক মোটর খুলতে ব্যস্ত। ওই লোকগুলো ছাড়া ম্যাগাজিন ফাঁকা। ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে ওরা। এতদূর এসেও মিশন বার্থ হতে চলেছে। টুলস না থাকায় কাজটায় ওরা হাতই দিতে পারবে না।

এক মিনিট পর ম্যাগাজিনের মেঝে ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। একটা রেইলিং-এর দিকে যাচ্ছে, এই রেইলিং হয়েই মিসাইল ও টার্পেডোগুলো ডকের দিকে যায়।

হেলাল জালল ডকইয়ার্ডের দেয়াল ঘেঁষে নোঙর ফেলা কয়েকটা মাছ ধরার নৌকার পিছনে ডেউয়ের দোলায় দুলছে আলবিদা। ডকইয়ার্ডের পিছনে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘরের মাঝখানে থেকে কয়েকটা কুকুর বৃষ্টির মধ্যে সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করছে। লায়লাকে নিয়ে বোটের নিচে রয়েছে নাসের ভেঙে ক্ষতবিক্ষত হবার পর হুইলহাউসের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাফি, দু'আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট তার পাশে রেডিওটা জ্যান্ত, কিন্তু কোন সঙ্কেত আসছে না। তবে সে কোন সঙ্কেত আশাও করছে না।

হারবারের কালো পানির উল্টোদিকে দায়ান দায়ান। বেশ কিছুক্ষণ আগে ফিশ ফ্যাক্টরি থেকে অ্যাস্কেল-গ্রাইভার আর ওয়েল্ডার-এর আলো ঝলসাতে দেখেছে সে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পরিবেশ-পরিস্থিতি বলছে, ওখানকার সব কাজ প্রায় শেষ। মাঝে মাঝে ওপর দিকের আকাশে সচল ত্রেনের মাথা আলোকিত হয়ে উঠছে সব কিছু লোড করা হচ্ছে। আর বেশি সময় নেই হাতে, ভাবল শাফি।

হারবারেও তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। লঞ্চ আর লাইটার-এর যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। পাঁচ হাজার টনী একজোড়া জাহাজ ডকইয়ার্ড থেকে আধ মাইল দূরে খোলা সাগরে অপেক্ষা করছে, সেদিকেই যাচ্ছে ওগুলো। দুর্গে ওদের কাজ শেষ হতে চলেছে, তাই ফিরে যাচ্ছে সবাই, ভাবল শাফি। কেউ জানে না গোটা ব্যাপারটা কিভাবে শেষ হবে।

‘তুমি বড় বীর, বলল রানা। ‘সময়ের মূল্য দিতে শেখোনি।’

ম্যাগাজিন স্টোর খালি করার দায়িত্বে রয়েছে লেফটেন্যান্ট। রাগে ও অপমানে মুখ গরম হয়ে উঠল তার। কিন্তু সে জানে একজন জেনারেলের কথায় রাগ করলে নিজের বিপদ ডেকে আনা হবে। ‘ইয়েস, স্যার, জেনারেল!’

‘এখন আমি ম্যাগাজিন ইসপেক্ট করতে চাই,’ বলল রানা।

‘জী? জেনারেল?’

ভুরু কঁচকাল রানা। ‘তুমি হিঁকু জানো না?’

‘ইয়েস, জেনারেল!’ লেফটেন্যান্ট হতভম্ব। এটা কি ইসপেকশনের সময়? তাতে কি কাজ দ্রুত সারা যাবে? কিন্তু জেনারেল জেনারেলই, তাঁর কথার অবাধ্য হওয়া চলে না। ‘এই যে, স্যার, শেলগুলো এখানে ছিল। সব পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনার নির্দেশে। আর এখানে ছিল মিসাইল ও টার্পেডো। ওগুলোও চলে গেছে।’ হাত তুলে ডকইয়ার্ডের দিকে যাবার টানেলটা দেখাল, হেঁটে চলে এল খালি

র‍্যাকগুলোর পাশে। মেঝেতে বাদামী রঙের বাক্সের একটা তুপ। 'এখানে ছিল স্বল আর্মস। মাত্র অল্প কিছু রয়ে গেছে। গ্ৰেনেড, মটার বম্ব। ডকইয়ার্ডে বার্জটা ফিরে এলেই শেষ কনসাইনমেন্ট রওনা হয়ে যাবে।'

'তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ,' কর্কশ গলার প্রশংসা ব্যঙ্গাত্মক শোনা‍ল, চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে রানা ডাকল, 'শামিম?'

ওই ডাকটাই নির্দেশ। লেফটেন্যান্টের মাথায় মেশিন পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে ধাম করে একটা বাড়ি মারল শামিম।

লোকটা পড়ে যেতে রানা বলল, 'লুকিয়ে ফেলো ওকে। হাসান, গ্ৰেনেডের বাক্স।'

একটার ওপর আরেকটা বাক্স রাখল হাসান, প্রতিটি বাক্সে দশটা করে গ্ৰেনেড, দু'পাশে ধরার জন্যে রশি আছে।

টানেলের দিকে এগোল রানা। 'চলো দেখি ডকইয়ার্ড বা প্ল্যাটফর্মে কি ঘটছে।'

নয়

টানেলটা পঞ্চাশ গজ লম্বা, আ‍লোয় ভেসে যাচ্ছে। দু'পাশে রেললাইন, এই রেললাইন ধরেই ট্রলিগুলো টর্পেডো আর মিসাইল নিয়ে যায়। টানেল ধরে অনেক লোক আসা-যাওয়া করছে, সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত। রানার ইউনিফর্মে চোখ পড়ামাত্র দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছে তারা। জনপ্রিয় ব্যক্তি, ভাবল হাসান।

বিশ গজ এগিয়েছে ওরা, পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হল্ট!'

রানার হৃৎপিণ্ড ডাঙায় তোলা কৈ মাছের মত লাফ দিল। ডান হাতটা টিউনিকের ভেতর ভরল ও। শামিমের হাত এত সাবধানে নড়ল, ওটা যেন একজন পকেটমারের হাত, মেশিন পিস্তলের গ্রিপে পের্চিয়ে গেল একটা আঙুল। বাক্সের রশি ধরা হাসানের হাতের তালু ঘামতে শুরু করল। আধপাক ঘোরার সময় পায়ে ব্যথা পেল রানা। 'কি?'

ইউনিফর্ম আছে, কিন্তু ব্যাজ নেই, চশমা পরা খাটো এক লোক, হাতে একটা খাতা। জেনারেলের ইউনিফর্ম সে গ্রাহ্য করছে না। 'রিকুইজিট ফর্ম পূরণ করাটা জরুরী, স্যার,' বলল সে। 'ম্যাগাজিন থেকে কিছু নিয়ে যেতে হলে সেটাই নিয়ম।'

'তুমি ইনভেন্টরি ক্লার্ক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইয়েস, জেনারেল।'

'ঠিক আছে, কর্পোরাল,' বলল রানা। 'খাতাটা দাও, আমি সই করছি।'

মাথা নড়ল ক্লার্ক। 'ওধু সই করলে হবে না, স্যার। গ্যারিসন ডিউটি অফিসারের সই করা রিকুইজিশন ফর্ম থাকতে হবে আপনার কাছে।'

রানার গলার আওয়াজ ভাঙা কাঁচের ঘষা খাওয়ার মত শোনা‍ল। 'তুমি জানো আমি কে?'

রানার ইউনিফর্মের ওপর চোখ বুলাল ক্লার্ক। 'ইয়েস, স্যার। আপনি গ্যারিসন কমান্ডার, স্যার।'

'আর রিকুইজিশন ফর্ম কে সই করে?'

'ডিউটি অফিসার, স্যার।'

'কার নির্দেশে?'

'আপনার নির্দেশে, স্যার।'

'তো?'

ক্লার্ক বলল, 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, স্যার। ডিউটি অফিসারকে অবশ্যই রিকুইজিশন ফর্ম সই করতে হবে।'

সময় দেখল রানা। চারটে পাঁচ। আর পঞ্চগুন মিনিট পর সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে যাবে। 'ঠিক আছে, কর্পোরাল। ডিউটি অফিসার ডকইয়ার্ডে, চলো তার কাছেই যাই।'

'কিন্তু, স্যার...'

'অডার!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। ক্লার্ক সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে, ভাবছে ও, ওদের ওপর থেকে সন্দেহের মাত্রা খানিকটা হলেও কমবে। 'পথ দেখাও!'

পথ দেখাল ক্লার্ক। টানেলের মুখ পাঁচিল তুলে দু'ভাগ করা। একদিকে চলে গেছে রেলপথ, আরেক দিকে একটা গেট, ভেতরে লোকজন চলাচলের রাস্তা। গেটের পাশে চওড়া একটা সেন্টি বক্স। ভেতরে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর ইউনিফর্ম পরা গার্ড বসে আছে।

আড়চোখে রানা দেখল, মেশিন পিস্তলের গ্রিপ থেকে আঙুলটা এখনও সরায়নি শামিম। ভাবল, ওর সঙ্গেও একটা মেশিন পিস্তল থাকলে ভাল হত। কিন্তু আছে শুধু একটা ল্যুগার, আর ইনসিগনিয়া ও পদক সহ জেনারেলের ইউনিফর্ম। এতেই অবশ্য কাজ চলে যাচ্ছে—এখন পর্যন্ত। তবে, ক্যাপ-এর নিচে মুখটা আসল নয়।

ক্যাপটা চোখের ওপর আরও একটু নামিয়ে আনল রানা।

সেন্টি বক্সে বসা লোক দু'জনের ইউনিফর্মের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, বেলেট দাগ পড়েছে, জুতোয় তুষারের মত লবণ জমে আছে। দু'জোড়া চোখ তীক্ষ্ণ, অস্থির। জেনারেলের ইউনিফর্ম দেখে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো তাদের। চেয়ার ছেড়ে দ্রুত দাঁড়াল, স্যালুট করল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, চেহারা যুটে উঠল গর্ব।

স্যালুটের জবাবে ক্যাপ স্পর্শ করল রানা, পরমুহর্তে ওদের দিকে পিছন ফিরে গেটের দিকে ফিরল 'খোলো!'

গেট খুলে দিল একজন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গার্ড। স্যালুট করল আবার। রানার পিছু নিয়ে শামিম আর হাসান গেট পেরুল, ওদের সবার সামনে রয়েছে ম্যাগাজিন ক্লার্ক। লোকটা এই মুহূর্তে খুশি, কারণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার এই সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। গুরুত্বপূর্ণ অফিশিয়াল একটা কাজে সে-ও অংশগ্রহণ করছে। মনে মনে লোকটার প্রতি কতজ্ঞ বোধ করল রানা। ম্যাগাজিন ক্লার্ক সার্টিফিকেট হিসেবে ভূমিকা রাখছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর গার্ড দু'জন তাকে চেনে।

গেট পেরুতে যাচ্ছে ওরা। ডান হাতটা ইউনিফর্মের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে রানা, মাথা নত, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মেরুদণ্ড বেয়ে ঘামের ধারা নামছে, অনুভব করছে ও।

‘জেনারেল!’ গার্ডরুম থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। শব্দটা বিশ্বয়সূচক প্রশংসা, নাকি হতবিস্বল হয়ে ডেকে ওঠা, বোঝা গেল না।

ওনেও না শোনার ভান করে আরও এক পা এগোল রানা।

‘স্যার, জেনারেল, প্লীজ থামুন,’ এবার স্পষ্ট, দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

‘শান্ত থাকো,’ ইংরেজিতে ফিসফিস করল রানা। তারপর জেনারেলের বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ‘কি চাও?’

‘জেনারেল যদি দয়াকরে তাঁর পাস দেখান, প্লীজ।’

মুদু, বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল রানা। ‘ক্লার্ক,’ বলল। ‘ওদেরকে তোমার পাস দেখাওনি?’

চশমার ভেতর চকচক করছে ক্লার্কের চোখ, পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

‘জলদি!’ ধমক দিল রানা। ‘সময় নষ্ট হচ্ছে।’

মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গার্ড ক্লার্কের পাসে একবার চোখ বুলিয়েই ফেরত দিল। ‘এবার, স্যার, জেনারেল, আপনার পাস।’

অনুভূতিটা আরামপ্রদ নয়, রানার তলপেট যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। লোকটার কথায় ঠাণ্ডা ক্ষুরের ধার।

সকৌতুক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গ্রেনেডের বাক্সগুলো মেঝেতে নামাল হাসান, মেশিন পিস্তলের গ্রিপ ধরা হাত ঘামে ভেজা। অস্ত্রটা ঘোরাল অন্যমনস্কতার ভান করে, তাক করল যে গার্ড কথা বলছে না তার দিকে। প্রথম গার্ড, যে কথা বলছে, তার চেহারা অদ্ভুত দেখাচ্ছে—বিস্বল তো বটেই, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠে দুঃসাহসী হয়ে ওঠার চেষ্টাও আছে। কি ঘটছে, বুঝতে পারল হাসান। প্রথম গার্ড জেনারেলকে নিশ্চয়ই ভালভাবে চেনে। ইউনিফর্ম দেখে আচেনা লোককেই চেনা বলে ধরে নিয়েছিল। সন্দেহ হওয়ায় ডেস্কের পিছনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে।

মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

প্রথম গার্ড নিচের ঠোট চুষল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, ‘স্যার, জেনারেল, আপনার নাম?’ ডেস্ক লেভেলের নিচে নেমে গেছে তার ডান হাত। ওখানে নিশ্চয়ই একটা অ্যালার্ম বাটন আছে।

মেশিন পিস্তলের সিলেক্টর সিঙ্গেল শট-এ সরাল হাসান, ট্রিগারে শক্ত করল আঙুল। লক্ষ করল, শামিম কাঁধে ঝোলানো মেশিন পিস্তল থেকে হাত সরিয়ে রেখেছে।

হাত দুটো সামান্য উঁচু করে দু’দিকে মেলে দিল শামিম। ‘ফর গড’স সেক, তোমরা জানো না কার সঙ্গে কথা বলছ?’

এম.পি. সেক্সি জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলল। তবে কোন আওয়াজ বেরুল না। কারণ দু’দিকে হাত মেলে দেয়ার ভঙ্গি করে শামিম আসলে হামলা চালিয়েছে। প্রথম গার্ডের মুখে লাগল ডান হাতের ঘুসি, নাকের ঠিক নিচে, ভাঙা হাড় সরাসরি মগজে সঁধিয়ে গেল। অপর তালুতে ছিল খুদে ছুরিটা, সেটা ছুটে গিয়ে বিধে গেছে

দ্বিতীয় গার্ডের বুকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলল সেটা শামিম, তারপর আবার গাঁথল। একজোড়া হেলমেট কংক্রিটের মেঝেতে ধাতব শব্দ তুলল।

তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা, সম্ভবত এক সেকেন্ড স্থায়ী হলো। পরক্ষণে কি যেন পাশ কাটাল হাসানকে। চশমা পরা লোকটা, ক্লার্ক। একটা পা বাড়াল হাসান। মুখ খুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। কংক্রিট মেঝেতে ঘষা খেয়ে দূরে সরে গেল চশমা। হাসানের দিকে মুখ তুলল সে, কিন্তু সবই ঝাপসা দেখছে। ফিসফিস করল, 'প্লীজ!'

ক্লার্কের দিকে তাকাল রানা। লোকটা এম.পি. নয়, এমনকি যোদ্ধাও নয়—গোবেচার। কেরানী মাত্র।

কিন্তু এই লোক ওদের মিশন ব্যর্থ করে দিতে পারে

মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল রানা।

থ্যাচ্ করে একটা শব্দ হলো। আবার যখন চোখ ফেরাল রানা, স্থির হয়ে গেছে ক্লার্ক, মাথার একপাশ মেঝের সঙ্গে লেগে আছে, তবে নিঃশ্বাস ফেলছে।

মেশিন পিস্তলের ব্যারেলের দিকে তাকাল শামিম। 'ভয় হচ্ছিল, এটা না বেঁকে যায়।'

দু'জন গার্ড আর ক্লার্ককে সেন্দ্রি বস্ত্রের একপাশে ফেলা ডেস্কের পিছনে টেনে আনল ওরা। ক্লার্ক তখনও নিঃশ্বাস ফেলছে। ওখান থেকে বেরিয়ে লোডিং প্ল্যাটফর্মে চলে এল ওরা।

মোবারক তার কিচেন টেবিলে বসে চার্টের পাশে একটা ম্যাপ ঝাঁকছিল, সেই ম্যাপে চিহ্নিত উপকূল রেখায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বিশাল প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা হয়েছে গ্র্যানিট ভেঙে। প্ল্যাটফর্ম আসলে একটা নয়, চারটে। কোনটা ডকিং ফ্যাসিলিটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কোনটা লোড করার কাজে। ম্যাগাজিনে প্রবেশ করার পথটা তৈরি করা হয়েছে শেষ প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে, নিচু একটা পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে। বাকি তিনটেও একই সমান্তরাল রেখায় তৈরি। পাকা চাতালের ওপর রেললাইন আছে। এক সময় এই রেলপথ মাছ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হত। এই মুহূর্তে কোন প্ল্যাটফর্মেই মাছ ধরার কোন ট্রলার বা বোট নেই। তার বদলে কয়েক সারি ক্রেনের নিচে লম্বা, চকচকে ও পিচ্ছিল দর্শন তিনটে সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার দেখা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের এখানে সেখানে বৃষ্টির পানি জমেছে। মুখে সিগারেট নিয়ে সেই পানির ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে তিনজন লোক। পরনে ঢোলা ওভারঅল, চেহারায় উদ্বেগ বা সতর্কতার ছিটেফোঁটাও নেই। রানা বা ওর সঙ্গী গার্ডদের দিকে ভাল করে তাকালও না। তাদের কাজ শেষ, যে যার ডেরায় ফিরে যাচ্ছে।

সবচেয়ে কাছের সাবমেরিনে একদল লোক কাজ করছে। কয়েকটা বাস্কে সম্ভবত অক্সি-অ্যাসেটিলিন ওয়েল্ডিং গিয়ার ভরা হচ্ছে। ক্রেনগুলো সচল, রসদ ভরার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সবুজ শাক-সজি ভরা ট্রে আর দুধের ক্যান দেখতে পেল রানা।

নীল ওভারঅল পরা আরও কিছু লোক প্ল্যাটফর্ম ধরে এগোচ্ছে। ওদিকে একটা বিল্ডিং রয়েছে, বিল্ডিংয়ের নিচে টানেল, ভেতর থেকে তেলে ভাজা পিঁয়াজের গন্ধ ভেসে আসছে। ওটা ক্যানটিন, বোঝা গেল। হাতে টুলবক্স নিয়ে ক্যানটিনে যাচ্ছে

ডক-কর্মীরা। ওখানে তারা খাওয়াদাওয়া সারবে, নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র বুঝে নেবে। হারবারের দূর প্রান্ত থেকে ভোরের বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে লক্ষ এঞ্জিনের আওয়াজ। ডকইয়ার্ড কর্মীদের পৌছে দিচ্ছে খোলা সাগরে নোঙর ফেলা জাহাজে। দুটো জাহাজ, দুটোর মানুষলেই পতপত করে পতাকা উড়ছে।

আরও দু'জন ডক-কর্মী ওদেরকে পাশ কাটাল। সচেতনভাবেই ওদের চোখের দিকে তারা তাকাল না। দু'জনের একজন প্রকাণ্ডদেহী, প্রায় শামিমের মতই। এরকম একটা সুযোগ পাবার অপেক্ষাতেই ছিল রানা। 'এই যে, তোমরা!'

স্কুল পালানো কিশোরদের মত অপরাধী লাগল লোক দু'জনকে। একজন তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেট ফেলে দিল, বুটের নিচে পিষে আগুন নেভাল। বিশালদেহী লোকটা সিগারেট ফেলেনি। তবে সেটা এখনও ধরায়নি সে।

'ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তোমরা কোন অপরাধ করোনি,' বলল রানা।

লোক দু'জন একদম নড়ছে না। কথাও বলছে না।

'ইচ্ছে হলে সিগারেট খেতে পারো,' বলল রানা। ওদের দিকে আরও একজন লোক হেঁটে আসছে, একা। বাম হাতে জেনারেলের লাইটার বের করে দীর্ঘদেহীর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল ও। 'ছোট্ট একটা কাজ আছে,' বলল। 'এই, তুমি!'

নিঃসঙ্গ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ম্যাগাজিন টানেলের দিকে হাত তুলল রানা। 'ওদিকে চলো।' ঘুরে টানেলে ঢুকে পড়ল ও।

বাইরে ভোরের স্নান আলো ফুটছে, টানেলের ভেতর বয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যা। রাত জাগা ডক-কর্মীদের চোখ লাল ও ঢুল ঢুল, ক্লান্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, হাই তুলছে একটু পরপরই। পেটে কিছু দিয়ে জাহাজে উঠতে চায় তারা, তারপর একটানা লম্বা ঘুম দেবে। দীর্ঘদেহী নড়ল না, জানতে চাইল, 'কি? কেন?'

'আগে এখানে এসো তো,' জেনারেলের কর্কশ গলা।

সবাই টানেলে ঢুকছে দেখে দীর্ঘদেহী লোকটাও ঢুকল এবার। দেয়ালে ইম্পাতের কয়েকটা দরজা, ভেতর থেকে তাজা রক্তের গন্ধ ভেসে আসছে। একটা দরজা দেখিয়ে রানা বলল, 'এখানে এসো।'

ঘুরে রানার দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী। 'কেন?' প্রশ্ন করার পর ব্যাপারটা লক্ষ করল সে। একজন বডিগার্ড তার দুই চোখের মাঝখানে মেশিন পিস্তল তাক করে আছে। কথা না বাড়িয়ে সামনে এগোল লোকটা। তার পিছু নিয়ে বাকি দু'জনও।

'ওভারঅল খুলে ফেলো,' বলল রানা।

'প্রয়োজন থাকলে নিজে খুলে নিন,' দৈত্যাকার লোকটা বলল। সে ক্লান্ত, কিন্তু চেহারা ভয়ের লেশমাত্র নেই।

রানা কিছু বলতে যাবে, হঠাৎ হাত চালাল লোকটা। ইচ্ছে ছিল রানার বুকে দুই হাতের ধাক্কা মারবে, তারপর বেরিয়ে যাবে টানেল থেকে। কিন্তু হাত দুটো রানার নাগালই পেল না, তার আগে সে নিজেই আক্রান্ত হলো। আঘাতটা কোথেকে এল, টেরই পায়নি। শুধু অনুভব করল কেউ তার মাথায় কামান দেগেছে।

কাজটা শামিমের লোকটার মাথায় মেশিন পিস্তলের বাড়ি মেরেছে।

বাকি দু'জন লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকল—লোকটার নিঃসাড় শরীর থেকে ওভারঅল খুলে ফেলল শামিম, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া টুলগুলো বাস্তবে ভরে রাখল।

‘কাপড় খোলো,’ বলল রানা।

লোক দু’জন তাড়াতাড়ি হাত চালাল।

‘দরজা,’ বলল রানা।

দরজার সামনে চলে এল রানা। বাইরে থেকে বন্ধ ওটা, ল্যাচ দিয়ে। ভেতরে একটা লকার পাওয়া গেল, রঙের কৌটা সাজানো, দশ ফুট লম্বা।

‘টোকো,’ বলল রানা

একজন জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু পরে আমরা বেরুব কিভাবে?’ আতঙ্কে নীল হয়ে আছে চেহারা।

জবাব না দিয়ে রানা প্রশ্ন করল, ‘সাবমেরিনে তোমরা ওঠো কিভাবে?’

‘আমাদের সঙ্গে পাস আছে।’

‘দেখাও।’

ভাঁজপড়া একটা কার্ড বের করল লোকটা, তেলের দাগ লাগা।

‘আর কিছু?’

‘না। আপনারা...এ-সবের মানে কি?’

লোকটার নাকের সামনে চোখ সরিয়ে এনে হিসহিস করে বলল রানা, ‘মানেটা শুধু আমি জানি। অজ্ঞ থাকাই তোমাদের জন্যে মঙ্গল। আমরা সাবমেরিনে উঠব। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চাই। আমরা যদি ধরা পড়ি, তোমাদের সম্পর্কে একটা কথাও কাউকে বলব না—আর মনে রেখো, এই দরজা সাউন্ডপ্রুফ। অর্থাৎ একটাই কাজ করার আছে তোমাদের, যদি বাঁচতে চাও।’

বিরতি নিল রানা, দরদর করে ঘামছে। শামিম আর হাসান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। রানার মত তারাও জানে খুব বেশি’ হলে আর আধ ঘন্টার মত সময় আছে। ‘তোমরা যদি সত্যি কথা বলো, ভয় পাবার কোন কারণই নেই। আর যদি সত্যি কথা না বলো, এই লকারই হবে তোমাদের কবর।’

লোকটা ঢোক গিলে বলল, ‘তাহলে...সত্যি কথাই বলি...একটা শব্দ আছে।’

‘বাহ, এই তো!’ অভয় দিয়ে হাসল রানা।

‘বেনিন,’ গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, ফিসফিস করল লোকটা।

‘গ্যাঙওয়ে সেন্দ্রিকে এই কোডওয়ার্ড বেনিন না বললে...’

‘বুঝেছি। কিন্তু তোমার এই কথা যদি মিথ্যে হয়, এই আন্ডারপ্যান্ট পরেই মারা যেতে হবে।’

‘স্যার, আমি সত্যি কথা বলছি।’

‘তোমার ওভারঅল, বলল রানা। লোকটার জুতোর দিকে তাকাল। ‘ওটার সাইজ বলো।’

‘বিয়াল্লিশ।’

‘ওগুলোও আমার দরকার।’

পাঁচ মিনিট পর তিনজন ডক-কর্মীকে প্ল্যাটফর্ম ধরে ফেরীর দিকে হাঁটতে দেখা গেল, হাতে নীল এনামেল করা টুলবক্স, মুখে সিগারেট। ফেরী ওদেরকে জাহাজে তুলে দেবে, জাহাজ হাইফা হয়ে তেল আবিবে ফিরে যাবে, অর্থাৎ দায়ান হারবারে

বিশেষ একটা কাজ সেরে নিজেদের স্থায়ী কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে ওরা। বিশেষ দায়িত্ব পালন করায় এক ইঞ্চি ছুটি পাওনা হয়েছে ওদের, কাজেই আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠার কথা ওদের। কিন্তু তা না, তিনজনকেই বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের বেশ অনেকদূর পর্যন্ত মাথার ওপর ছাদ আছে, ছাদের বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। মুখ তুলে আকাশ দেখল রানা। বাতাসের ঝাঁটা খেয়ে সমস্ত মেঘ বিদায় নিয়েছে, আকাশের রঙ পাখির ডিমের মত নীলচে। চারদিকে প্রচুর লোকজন আর ব্যস্ততা, তাসত্ত্বেও নতুন ভোর ভারি সুন্দর লাগল ওর চোখে। সাবমেরিন, ক্রেন, লোকজন ইত্যাদির ওপর চোখ বুলিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। কোন কারণ নেই, বিনা প্ররোচনায়, যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার কিংবা হয়তো লাখ লাখ মানুষকে খুন করার আয়োজন চলছে এখানে।

আজকের এই সুন্দর সকালটা হয়তো রক্তাক্ত হতে যাচ্ছে। তবে তার প্রয়োজন আছে। শামিম আর হাসানের দিকে তাকাল রানা। দু'জনের চেহারাই গম্ভীর, চোখে প্রত্যয়ের ছাপ। তারাও ওর মত একটা অন্যায় কাজকে ঠেকাবার জন্যে প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

শান্ত গলায় শামিমকে রানা বলল, 'আলবিদাকে দরকার হবে আমাদের।'

'সে-ব্যবস্থা আমার ওপর ছেড়ে দাও, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল শামিম।

গ্র্যানিট-এর প্রথম আঙুলটার দিকে তাকাল রানা, প্ল্যাটফর্ম থেকে হারবারের দিকে বিস্তৃত, দু'পাশে নিস্তরঙ্গ পানি। পানির এই দুই গলিতে সাবমেরিনের বেলুন আকৃতির প্রেশার হাল আর সরু স্টীল ডেক দেখা যাচ্ছে। ওদিকে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক দুটো, একটা বাম দিকে চলে গেছে, আরেকটা ডান দিকে। সাবমেরিন দুটোয় পৌছানোর এটাই একমাত্র পথ। প্রতিটি গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায় একজন করে নাবিক দাঁড়িয়ে আছে, কাঁধে রাইফেল, ক্যাপের রিবন ঘাড়ের কাছে ভোরের বাতাসে দোল খাচ্ছে।

গ্রেনেড নিয়ে এই বাধা উপকাতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'প্যারোস্কাইড,' বলল হাসান, বাতাস শুঁকছে।

'সরি?'

'হাইড্রোজেন প্যারোস্কাইড। সাবধান, গায়ে যেন না লাগে। জিনিসটা ক্ষার। লোহা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কোন সুপারিশ আছে,' চাপা কণ্ঠে বলল রানা।

'আছে,' বলে রহস্যটা ব্যাখ্যা করল হাসান।

'অদ্ভুত।' বড় করে শ্বাস নিল রানা। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে জানাল, 'আমি ডান দিকে যাচ্ছি, তুমি বাম দিকে যাও।'

শামিম বলল, 'গুড লাক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাগ্য বলে একটা কিছু তো অবশ্যই আছে, তবে সেটা ওদের চেয়ে শামিমেরই বেশি দরকার। টুলবক্স ভর্তি গ্রেনেড নিয়ে সাবমেরিনে চড়তে হবে ওদেরকে, কিন্তু শামিমের কাজটা আরও বেশি বিপজ্জনক।

ওরা যে গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এসেছে, কোনভাবেই তা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এড়িয়ে যাবার কোন ইচ্ছাও ওদের কারও মনে জাগেনি। মৃত্যুকে ওরা খোড়াই গ্রাসা করছে। পরপারে যেতে হয় যাবে, কিভাবে যাবে সেটার কোন গুরুত্ব

নেই।

রানা মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছে না। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে।

ভিড়ের সঙ্গে মিশে ফেরীর দিকে রওনা হয়ে গেছে শামিম। প্যাটফর্ম ধরে সেন্টিদের দিকে এগোল রানা ও হাসান। হাসান হাত দুটো পকেটে ভরে রেখেছে, ঠোট সুরু করে শিস দিচ্ছে।

ছোকরার প্রশংসা করতে হয়, ভাবল রানা। উদ্বিগ্ন হয়ে লাভ কি!

হাসান ভাবছে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড-এর কথা। প্রথমত বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল সে, তার ওপর দীর্ঘদিন বিস্ফোরক নিয়ে পড়াশোনা ও কাজ করেছে, সেই সূত্রে জানে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইডের ক্যাটালিস্ট হলো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অক্সিজেন থেকে হাইড্রোজেনকে আলাদা করলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে, তার তুলনায় গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজটাকে মনে হবে কেউ আঙুল মটকাল।

কাজেই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দরকার তার। কিন্তু সমস্যা হলো, এই জিনিস এখানে-সেখানে ফেলে রাখে না কেউ।

গ্যাংওয়ের নিচে নেমে এসেছে সে। সেন্টির দিকে তাকিয়ে ঠোট মোড়া হাসি উপহার দিল, পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল পাসটা। 'বেনিন,' সহজ সুরে বলল, টুলবক্সটা ঝাঁকিয়ে। 'ল্যাভাটারিতে সমস্যা, মাত্র দু'মিনিটের কাজ।'

সেন্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'তাহলে তো ভাই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয় গ্যাংপ্র্যাক্স ধরে উঠে যাচ্ছে হাসান।

ভিড় ঠেলে প্যাটফর্মের ঠোটে এসে থামল শামিম। মানুষ লাইন দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু শৃঙ্খলার বড় অভাব। প্যাটফর্মের নিচে নেমে গেছে চারটে লোহার সিঁড়ি, প্রতিটি সিঁড়ির নিচে একটা করে লঞ্চ। প্রতিটি সিঁড়ির মাথায় হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর একজন করে অফিসার লাইনের প্রথম লোকটা তার সামনে পৌঁছলে প্রথমে সে আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করছে, কার্ডের ফটোর সঙ্গে খুঁটিয়ে মেলাচ্ছে লোকটার চেহারা, তারপর তালিকা থেকে খুঁজে বের করছে তার নাম সব কিছু ঠিকঠাক মিলে গেলে লোকটাকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে দিচ্ছে।

প্যাটফর্মের গা থেকে রওনা হয়ে সরাসরি জাহাজ দুটোর দিকে ছুটছে লঞ্চগুলো, সে-দুটো হারবারে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছে। ওগুলো আসলে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনীর ভাড়া করা জাহাজ, প্রতিটি ডেকে বালির বস্তা দিয়ে আড়াল তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের ব্যারেল।

সাবধানতা অবলম্বনে কোন ক্রটি রাখা হয়নি।

শামিমের ওভারঅল আর আইডেনটিটি কার্ড-এর মালিক বেন দাহ। ফটোয় যতই তেলের দাগ লাগুক, দাহ আর শামিমের শারীরিক গঠন প্রায় একই রকম হলেও, লালচে চুল আর নীল চোখ ঝাপসা হয়নি। তাছাড়া, তেলআবিবগামী কোন জাহাজে ওঠার ইচ্ছেও শামিমের নেই।

ভিড়ের মধ্যে ঘুরল শামিম, বিড়বিড় করে নিজেকে গাল-মন্দ করছে লোকজনকে ঠেলে ফিরে আসছে সে, ভাবটা যেন ভুলে কিছু ফেলে আসায় আনতে

যাচ্ছে সেটা ।

লাইনের গোড়ায় ফিরে এসেছে শামিম, এই সময় একটা সাবমেরিনের ডিজেল এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, বোঝা গেল এগজস্ট থেকে কালো মেঘের মত ধোয়া বেরিয়ে আসতে দেখে । রাহাত খান ব্রিফিং করার সময়ই আভাস দিয়েছিলেন, ইসরায়েলিরা সৌদি আরব আর কুয়েতে মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে যে সাবমেরিন ব্যবহার করবে সেগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার হবারই বেশি সম্ভাবনা । বিসিআই-এর কাছে রিপোর্ট আছে, জার্মানী আর রাশিয়ার কাছ থেকে পুরানো বেশ কয়েকটা সাবমেরিন অনেক আগেই কিনেছে তারা । দেখতে নতুন আর চকচকে হলেও, ওগুলো আসলে পুরানোই ।

শামিমের ধারণা সাবমেরিনগুলোয় এমন সব পরিবর্তন আনা হয়েছে, দৈবাৎ আন্তর্জাতিক জলসীমায় দেখা গেলে ওগুলোকে ইসরায়েলি বলে প্রমাণ করা সহজ কাজ হবে না ।

এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার অর্থ যে-কোন মুহূর্তে সাবমেরিনটা রওনা হয়ে যাবে সময় দেখল শামিম । ঘড়ির কাঁটা ধরে রওনা হলে আর মাত্র আঠারো মিনিট পর । অবশ্যই ঘড়ির কাঁটা ধরেই কাজ শুরু করবে ওরা ।

হারবারের মুখ থেকে উল্টোদিকে, হেলাল জাললু শহরটার দিকে তাকাল শামিম, ভোরের স্নান আলায়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে । বাড়ি-ঘরের জানালা এখনও খোলেনি, একটা মসজিদ থেকে মুসল্লীদের বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে । হারবারের মুখে এক সারি অয়্যারহাউস, তারই পাশে জেলে-নৌকার ভিড় । আলো কম হওয়া সত্ত্বেও আলবিদার কালো খোল চিনতে পারল সে, লাল পাল তুলে রেখেছে ।

চারশো গজ দূরে । ভাল সাঁতার জানা থাকলে এটা কোন দূরত্বই নয় । কিন্তু এই চারশো গজ খোলা সাগর আর হারবারের মধ্যে একটা সরু গলা তৈরি করেছে, ফলে স্রোত আর ঢেউ দুটোই খুব তীব্র । এখন ভাটার সময়, প্ল্যাটফর্মের নিচে পানির সারফেস দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে । গম্ভীর হলো শামিম দূরত্বটুকু পেরুনো কঠিনই হবে ।

ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে, ওভারঅলের পকেট থেকে পেন্সিল আর নোটবুক বের করল শামিম । সর্বশেষ প্রান্তের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগোচ্ছে । তাকিয়ে আছে সবচেয়ে দূরের সাবমেরিনটার দিকে । গ্যাঙওয়ের নিচে দাঁড়ানো সেক্ট্রিকে পাশ কাটাল । কেউ তার দিকে তাকিয়ে নেই । কেন থাকবে? নীল ওভারঅল পরা বিশালদেহী একজন ইমপেক্টর সে, ভুরু কঁচকে প্ল্যাটফর্মের পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, কোথাও অপরিচ্ছন্নতা বা অনিয়ম দেখলে নোটবুকে টুকে নিচ্ছে ।

প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে ঝুঁকে লোহার ধাপগুলোর দিকে তাকাল । কেউ তাকিয়ে থাকতেও পারে, তাই পেন্সিলটা কানে গুঁজে ঠোঁট কামড়াল, মাথা নাড়ল এদিক ওদিক । তারপর ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে ।

প্ল্যাটফর্মের লেভেল থেকে নিচে নেমে আসায় এখন আর তাকে কেউ দেখতে পাবে না, দু'চারজন সেক্ট্রি ছাড়া । আর মাত্র ষোলো মিনিট সময় আছে, আশা করা যায় দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদেরকেও প্রত্যাহার করে নেয়া হবে । এই গ্যারিসন বা হারবার বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার ব্যবহার করছে ইসরায়েলিরা,

সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে গেলে এখানে নৌ বা সেনাবাহিনীর কোন সদস্য থাকবে বলে মনে হয় না।

নিচের ধাপে নেমে এসে নোটবুক আর পেন্সিল পানিতে ফেলে দিল শামিম। গা থেকে ওভারঅল আর পা থেকে বুট খুলে ফেলল, এক আন্ডারপ্যান্ট ছাড়া বাকি কাপড়ও শরীরে রাখল না। তারপর লাফ দিয়ে পড়ল পানিতে।

‘বেনিন,’ গ্যাঙওয়াতে দাঁড়ানো সেক্টিকে বলল রানা হাসান যে গ্যাঙওয়াে ধরে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

তাকালও না, কার্ডটা ফেরত দিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল সেক্টি। গ্যাঙওয়াে ধরে উঠে এল রানা, সাবমেরিনের স্টীল ডেকে দাঁড়াল, টুলবক্সের এনামেল হ্যান্ডেল পিচ্ছিল হয়ে আছে মুঠোর ভেতর। সামনে একটা খোলা হ্যাচ। ও জানে, মিসাইল ও টর্পেডো রুম সামনের দিকে। এত বড় আকৃতির সাবমেরিন, একটা গ্রেনেড তেমন কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবু, হাসান বলেছে, গ্রেনেড ব্যবহার করতে হবে একটা ফিউজ বা একটা প্রাইমার হিসেবে, টন টন হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড বিস্ফোরিত করার জন্যে। তাতে নাকি সাবমেরিন ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ওটার সঙ্গে বাকি সবাইও। রানা ভাবল, আমি?

হ্যাচ-এর দিকে এগোল। ডেকে থাকা স্বস্তিকর। নিচে নামলে দম বন্ধ হয়ে আসবে। সাবমেরিন মানে ইম্পাতের একটা শেল, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে পানির তলায় ডুব দেবে।

সহজ হোক বা কঠিন, কাজটা করতে হবে।

হ্যাচ থেকে ইম্পাতের ধাপ নেমে গেছে, নিচে হলদেটে আলো। ধাপ বেয়ে প্রায় নিচে নেমে এসেছে রানা, এক লোক মুখ তুলে তাকাল। মুখটা সুরু, চোখা দাড়ি আছে, চোখের নিচে কালো পুঁটলি। পেটি অফিসার। ‘তুমি এখানে কেন? কি চাও?’ জানতে চাইল সে।

‘টয়লেট চেক করব,’ এক গাল হেসে বলল রানা, যেন নিরীহ বোকাসোকা সরল সাধাশিধে মানুষ।

‘টয়লেটে কোন সমস্যা আছে বলে তো শুনিনি, বলল পেটি। ‘যাও, ক্যাপটেনের সঙ্গে আগে দেখা করো।’

‘ক্যাপটেন কোথায়?’ ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করছে, কল্পনা করল রানা।

‘কনিং টাওয়ারে। তাড়াতাড়ি করো!’

ডেকে ফিরে এসে ধাতব ধাপ বেয়ে কনিং টাওয়ারে চড়ল রানা, সেখান থেকে টাওয়ারের ভেতর নামল। নিচে তেল আর ঘামের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। আরও একটা গন্ধ পেল-প্যারোক্সাইড। লেদার জার্সি পরা এক লোক আরেক লোকের সঙ্গে তর্ক করছে। দু’জনেরই দাড়ি আছে, একজনের মাথায় নারকেলের আধখানা খোল আকৃতির টুপি। আরেকজনের মাথায় ক্যাপ খুক করে কেশে রানা বলল, ‘আমি টয়লেট মেরামত করতে এসেছি।’

ক্যাপ মাথায় লোকটা, ক্যাপটেন, ঝট করে ঘুরল। ‘এখন? আর সময় পেলে না? তাছাড়া, আমার তো জানা নেই টয়লেটে সমস্যা আছে কিনা।’ ভাগো, নেমে যাও

আমার বোট থেকে!’

‘আমাকে অর্ডার করা হয়েছে, ক্যাপটেন,’ বলল রানা। হ্যাচ থেকে দিনের আলো নেমে আসছে।

‘আমি ক্যাপটেন...’

‘কিন্তু জেনারেল আমাকে অর্ডার দিলেন...’

‘ও, আচ্ছা, জেনারেল! তাই বলা! কিন্তু...আচ্ছা, ঠিক আছে-যাও, দেখো টয়লেটের কি অবস্থা। কিন্তু শুনে রাখো, দশ মিনিট পর বুওনা হিল্লি আমরা। তখনও যদি তুমি সাবমেরিনে থাকো, তোমাকে আমি টর্পেডো টিউবে ঢোকাব।’

‘তার কোন প্রয়োজন হবে না,’ ঘোং ঘোং করে বলল রানা। তবে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গে আবার তর্ক জুড়ে দিয়েছে ক্যাপটেন, একজন ডক-কর্মীর পিছনে নষ্ট করার মত সময় নেই তার।

এঞ্জিন পিছনে। টর্পেডো আর আন্ডারওয়াটার মিসাইল লঞ্চার সামনে। কাজেই সামনে যেতে হবে রানাকে।

পেরিস্কোপকে পাশ কাটিয়ে ধাপ রেয়ে নামল। করিডর ধরে হাঁটছে। ত্রুদের মেসরুমকে পাশ কাটাল। রয়াকে সাজানো রয়েছে টর্পেডো আর মিসাইল। চারদিকে হলদেটে আলো। প্রচুর লোকজন। ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে। কোন পোর্টহোল বা জানালা নেই, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। পানির সারফেস থেকে নিচে রয়েছে তুমি।

আজবাজে কথা ভাববে না! এখনও প্ল্যাটফর্মের পাশে রয়েছে সাবমেরিন।

খোলা হ্যাচের তলা দিয়ে এগোল। ওর দিকে তাকাল পেটি অফিসার, চোখ ফিরিয়ে নিল। সামনে একটা গোলাকৃতি দরজা। অর্থাৎ করিডরের এখানেই সমাপ্তি। তবে বাল্কেড-এর উল্টোদিকে লম্বা একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে, চেয়ারের ডান ও বাম দিকে মোটা টিউব আর লম্বা মিসাইল লঞ্চার। একপাশে টর্পেডো, আরেক পাশে মিসাইল।

ওর ডান দিকে খুদে একটা কমপার্টমেন্ট। টয়লেট।

চারদিকে চোখ বুলাল। পেটি অফিসার লক্ষ করছে ওকে। চোখ মটকে টয়লেটে ঢুকল রানা, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। টুলবক্স ধরা হাতের মুঠো ঘামে ভিজে গেছে। আর বোধহয় পাঁচ মিনিট সময় আছে হাতে।

নতুন একটা শব্দ। কম্পন। এঞ্জিনগুলো স্টার্ট নিয়েছে। কোথাও একটা ঘন্টা বাজতে শুরু করল। যা করার এখুনি। পরে আর সময় বা সুযোগ পাওয়া যাবে না।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে কোন দিকে তাকাল না, মাথা চুলকাচ্ছে, করিডর ধরে হেঁটে এসে সোজা ঢুকে পড়ল টর্পেডো রুম-এটাই কাছে। ভেতরে দু’জন মাত্র লোক, রয়াকে তোলা টর্পেডো স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধছে। দু’জনেই সাধারণ নাবিক।

‘ধ্যেত,’ বিরক্তি প্রকাশ করল একজন। ‘বিরক্ত করার আর সময় পেলো না।’

‘সীল চেক করব,’ বলল রানা। ‘দু’মিনিটের কাজ। এগুলোর মধ্যে কোনটা তোমরা প্রথমে টিউবে ভরবে?’ ও জানে, নিষ্ক্ষেপ করার প্রয়োজন হোক বা না হোক, নিয়ম হলো পানির নিচে সাবমেরিন ডুব দেয়ার পরপরই টিউবে টর্পেডো ঢোকানো হয়। ‘ওগুলো,’ হাত তুলে দেখাল একজন রেটিং। ‘কিন্তু, ভাই, অসময়ে বিরক্ত

কোরো না তো! কাজটা শেষ করতে দাও-একটু পরই টিউবে টর্পেডো ভরতে হবে।’

রেটিং যে টর্পেডোগুলো দেখাল সেগুলো প্রথম র‍্যাকে রাখা হয়েছে। চাকা লাগানো র‍্যাক, সময় হলে গোলাকৃতি দরজার ভেতর দিয়ে টিউবের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। টর্পেডোগুলোর পিছনে চলে এল রানা, লোক দু’জন ওকে দেখতে পাচ্ছে না। সাবমেরিনের ইস্পাতের দেয়ালে একটা রড দেখতে পেয়ে গ্রেনেড-এর হ্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসা স্ট্রিং ল্যানিয়ার্ড দিয়ে একটা লুপ বানিয়ে ঝোলাল তাতে। তারপর গ্রেনেডের ক্যাপ খুলল, স্ট্রিং ফিউজ-এর শেষ প্রান্ত থেকে সাবধানে বের করে আনল পর্সলিন বাটনটা, সবশেষে স্ট্রিং ফিউজটা টর্পেডোর প্রপেলারের সঙ্গে বাঁধল।

মাত্র একটার কাজ শেষ হলো।

টুলবক্স থেকে স্প্যানার বের করে রেটিংদের পাশ কাটাল, কমপার্টমেন্টের উল্টোদিকে হেঁটে এসে পোর্টসাইডের নিচের টর্পেডোয় দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফিট করল। পাশ কাটাবার সময় রেটিংরা ওর দিকে তাকায়নি, তবে তার মানে এই নয় যে ও কি করছে দেখার জন্যে উঁকি মারবে না।

যদিও সেরকম কিছু ঘটল না।

তৃতীয় আর চতুর্থ গ্রেনেড ফিট করা হলো পরবর্তী সারির একজোড়া টর্পেডোয়।

রানার মাথার ওপর ইস্পাতের ডেকে বুট পরা লোকজন দ্রুত হাঁটাচলা করছে। এঞ্জিনের শক্তি ক্রমশ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে কম্পন। ‘সব ঠিক আছে, কোথাও কিছু লিক করছে না,’ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা। ‘সিউয়েজ পাইপ এদিক দিয়ে না গেলেই ভাল হত।’

রেটিং দু’জন ভাল করে ওর কথা শুনলই না। কমপার্টমেন্ট থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। হ্যাচটা এখনও খোলা। তাজা বাতাসের গন্ধ পাচ্ছে। দু’জন লোককে পাশ কাটিয়ে মইয়ের নিচের ধাপে পা রাখল।

কঠিন একটা হাত ওর কনুই চেপে ধরল। সুরটা কঠিন, জানতে চাইল, ‘টয়লেট মেরামত করতে এসে টর্পেডো রুমে কি করছিলে?’

ঘাড় ফেরাল রানা। লোকটা সেই পেটি অফিসার।

‘কাস্ট অফ!’ ডেক থেকে কেউ একজন হুঙ্কার ছাড়ল।

রানার মাথার ওপর বিকট ধাতব শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচ।

দশ

বিশ গজ দূরে অন্য এক জগতে রয়েছে হাসান। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ জানে হাতে আর মাত্র সাত মিনিট সময় আছে। সরাসরি কনিং টাওয়ারে পৌঁছায় সে, চার্টের ওপর ঝুঁকে থাকা ক্যাপটেন আর নেভিগেটিং অফিসারকে জানায়, ‘টয়লেট দেখতে এসেছি।’

দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। উচিত একটা কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হচ্ছে বলে নিজেকে নিয়ে স্বয়ং গর্বিত ও। তবে মরার আগে প্রকৃতিকে একবার দেখে নিতে চায়। সেজন্যেই বাইরে বেরুনো দরকার।

ও শুধু একা নয়, পেটি অফিসারও মারা যাবে, জানে রানা।

মুখ তুলে হ্যাচের দিকে তাকাল। একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। 'নামছি এবার,' ওপর থেকে চিৎকার ভেসে এল। অদৃশ্য হয়ে গেল মাথাটা। রানার হাত ছিল পিছনে, শিরদাঁড়ার কাছে; কোমরে, বেল্টের সঙ্গে আটকানো খাপ থেকে ছুরিটা বের করে আনল, এনেই ঘ্যাচ করে ঢুকিয়ে দিল পেটি অফিসারের বুকে। হাতলটা ছাড়েনি রানা, পেটি অফিসারকে ঠেলে বাস্কের ওপর ফেলে দিল, একটা চাদর টেনে ঢেকে দিল লাশটা। তারপর, যেন কিছুই হয়নি, চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠছে।

রানা উঠে আসতেই হ্যাচের ঢাকনি বন্ধ করে দিল ডেকে দাঁড়ানো লোকটা। একজন স্টিভিডর লাইন খুলে দিয়েছে। সাবমেরিন আর প্র্যাটফর্মের মাঝখানে চওড়া হচ্ছে সবুজ পানি। কনিং টাওয়ার থেকে কেউ একজন গর্জে উঠল, 'জাম্প!'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ক্যাপটেনকে দেখতে পেল। লোকটার চেহারায় অকারণ আক্রোশ, আর্মার প্লেটের ওপর উঁচু হয়ে জুঁকুঁকি তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'ডক-কর্মীদের পছন্দ করেন না,' বো লাইন হাতে বলল লোকটা। 'আমিও করি না,' পা উঁচু করে রানার কোমরে ধাক্কা দিল সে।

লাথিটা এড়িয়ে যেতে পারত রানা, মর্যাদা রক্ষার খাতিরে লোকটার পা ধরে ভেঙে দিতেও পারত। কিন্তু এই মুহূর্তে মর্যাদা নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবমেরিন থেকে নেমে যাবার তাগিদ রয়েছে ওর।

লাফ দিল ও। সাবমেরিনের প্রেশার হল-এ লেগে ধাতব শব্দ তুলল টুলবক্স। গভীর পানিতে ডুবে যাবার সময় নীল বাস্কটা যেন চোখ মটকাল ওকে। ওটার ভেতর তিনটে গ্নেন্ডে রয়েছে গেছে এখনও।

পরমুহূর্তে নাকে-মুখে পানি ঢুকল, প্র্যাটফর্মের দিকে সাঁতরাচ্ছে। শুনতে পেল গলা ছেড়ে হাসছে ক্যাপটেন, তবে সেদিকে মনোযোগ দিল না। ভাবছে, তৃতীয় সাবমেরিনটার কি হবে? হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে। ওটাকে ধ্বংস করার উপায় কি?

সাঁতার কাটছে শামিমও। চারশো গজ দূরে আলবিদা, এই দূরত্ব পেরুনো তার মত দক্ষ সাঁতারুর জন্যে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু চ্যানেলে পড়ার পর বিপদ আঁচ করতে পারল। তীব্র স্রোত ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। পানির ওপর শুধু মাথাটা তুলে রেখেছে, তা না হলে ইসরায়েলিরা ওকে দেখে ফেলতে পারে। মাথাটা দেখলে ভাববে একটা সীল। প্র্যাটফর্ম থেকে খানিক দূরে অ্যান্টি-সাবমেরিন নেট ছিল, একটু আগে সেগুলো জাহাজে তুলে নেয়া হয়েছে।

খরস্রোতা নদীর মত চ্যানেলটা, হারবারের সরু গলা থেকে খোলা সাগরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে শামিমকে। উজানের দিকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে

আলবিদার মাস্তুল। আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়।

প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব, উপলব্ধি করে মৃত্যু চিন্তা মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলল শামিম। রানা আর হাসানের কথা ভাবছে ও। বিশেষ করে রানার দক্ষতা সম্পর্কে তার ধারণা আছে, বিপদের সময় বা জরুরী মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে যেকোন অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা রাখে। হাসানের ওপরও আস্থা আছে তার। মনে মনে প্রার্থনা করল, মরছি তাতে কোন দুঃখ নেই। তবে মরার আগে সাবমেরিনগুলো ধ্বংস হতে দেখলে বড় ভাল লাগত।

আলবিদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। চিরকালের জন্যে নাগালের বাইরে পিছিয়ে গেছে ওটা। খোলা সাগরে তাকাতে জাহাজ দুটো দেখতে পেল। একজোড়া লঞ্চ এগোচ্ছে ওটার দিকে। কোথেকে যেন নতুন শক্তি ফিরে পেল সে, স্রোতের বিপরীতে সাঁতারে জাহাজগুলোর দিকে এগোচ্ছে, দশ ডিগ্রী ডান দিকে থাকছে।

অন্য কেউ হলে তার জন্যে ব্যাপারটা স্রেফ আশ্চর্য্য হত।

কিন্তু শামিমের জন্যে কাজটা সম্ভব। শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্রোতের উল্টোদিকে এগোচ্ছে সে, পানির একটা বো-ওয়েভ তৈরি করছে নাক দিয়ে। সাগরে বেরিয়ে আসার পর যে প্ল্যাটফর্ম থেকে পানিতে নেমেছিল, সেটা দৃষ্টি পথের বাইরে হারিয়ে গিয়েছিল। তবে পাঁচ মিনিট অমানুষিক পরিশ্রম করার পর বাম দিকে আবার ওটা দেখা গেল।

দুই জাহাজের মধ্যে যেটা কাছাকাছি, সেটার স্টারবোর্ড সাইডও এখন দেখতে পাচ্ছে শামিম। কিছুই ভাবছে না সে। প্রাণে বেঁচে যাবার আশা আছে, এই চিন্তাটাকেও প্রশ্ন দিচ্ছে না। শুধু প্রচণ্ড একটা জেদ কাজ করছে। থামা চলবে না, সাঁতরাতে হবে, তাই সাঁতরাচ্ছে। আর মাত্র দুশো স্ট্রোক। সাদা মুকুট পরা খাড়া একটা ঢেউ-এর শিরদাঁড়া পার হয়ে এল। একজোড়া ঢেউ বাঘের থাবার মত চড় কষল মুখে। নাক দিয়ে লোনা পানি ঢুকল ফুসফুসে, বিষম খেলো সে। এতক্ষণে সত্যি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বোধ হয় পারবে না। এবার তাকে তাকাতে হবে।

তাকাল শামিম।

আলবিদা অনেক অনেক দূরে ছিল, উজানের দিকে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বিশ কি বাইশ ডিগ্রী ডান দিকে, দূরত্বও অনেক কমে এসেছে।

বিপদ কাটেনি। এখনও খোলা সাগরে রয়েছে সে। তবে কোন সন্দেহ নেই, স্রোতটা এখন তাকে হেলাল জাললু শহরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকের একটা জেটি বা প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে রয়েছে ফিশিং বোটগুলো। সেগুলো ক্রমশ কাছে চলে আসছে।

তারপর, প্রায় অকস্মাৎই, পায়ে বালি ঠেকল। ফেলে আসা সাগরের দিকে তাকাল শামিম। ভাটার টানে সরে যাওয়ায় পানির রঙও বদলে গেছে। নিজেকে তিরস্কার করল মনে মনে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার ঝুঁকি না নিলেও চলত। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলে হেঁটে চলে আসতে পারত জেটিতে।

অন্য কেউ হলে পাগলের মত হেসে উঠত বা কেঁদে ফেলত। কিন্তু শামিম

অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। কর্তব্যই তার কাছে প্রথম গুরুত্ব। আলবিদায় পৌছুতে হবে তাকে—ওয়াটারপ্রুফ হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে—চার মিনিটের মধ্যে।

পানি কেটে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল শামিম।

গ্র্যানিট পাথরে গাঁথা লোহার ধাপ বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠছে রানা, কাশির সঙ্গে গলা থেকে পানি বেরুচ্ছে। সাবমেরিন ডকগুলোকে তিনটে বিশাল ফাটলের মত লাগছে দেখতে। ও যে সাবমেরিন থেকে নেমে এসেছে, সেটা সচল হলো।

তৃতীয় সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার স্থির হয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মের সর্বশেষ ধাপে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা, ওটার কনিং টাওয়ার থেকে চোখ সরেছে না। এত ক্লান্ত, যেন প্ল্যাটফর্মে ওঠার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

এই সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। তৃতীয় সাবমেরিনের কনিং টাওয়ারে হাসান। ক্যাপ পরা এক লোকের সঙ্গে তর্ক করছে সে, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল সাবমেরিনে ঢোকার অনুমতি চাইছে। ক্যাপ পরা লোকটা, ক্যাপটেন, মাথা নাড়ছে, অর্থাৎ বলতে চায় সাবমেরিন এখনি রওনা হয়ে যাবে, কাজেই ভাল চাও তো আমার সাবমেরিন থেকে নেমে যাও।

দূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না তর্কে কিভাবে জিতল হাসান, তবে তাকে হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা। তাড়াতাড়ি, ভাই, তাড়াতাড়ি! মনে মনে তাগাদা দিল ও। হাতঘড়ির ওপর দ্রুত চোখ বুলাতে অস্থিরতা আরও বাড়ল। পাঁচটা বাজতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি।

সর্বনাশ, অনেক দেরি করে ফেলেছে!

তারপর, হঠাৎ রানা খেয়াল করল, চারদিক থেকে অ্যালার্ম বাজছে। কখন থেকে বাজছে বলতে পারবে না, বোধহয় বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। কিন্তু চারদিক থেকে অ্যালার্ম বাজবে কেন? কি এমন ঘটল...

রানার জানার কথা নয়, একজন মেজর রিপোর্ট করতে গিয়ে জেনারেলের লাশ পেয়ে গেছে। সে-ই অ্যালার্ম বাজিয়ে সাবমেরিন ক্যাপটেনদের জানিয়ে দিচ্ছে—ইমার্জেন্সী, এই মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করো!

সেই কারণেই তিন মিনিট আগে রওনা হয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনগুলো।

কারণ না জানলেও, চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটতে দেখছে রানা। সাবমেরিনগুলো রওনা হয়ে যাচ্ছে, অথচ ওগুলোর একটায় রয়ে গেছে হাসান।

শরীর বা মনে কি যে ঘটল, বলতে পারবে না রানা, এক নিমেষে সমস্ত ক্লান্তি ভোজবাজির মত দূর হয়ে গেল; এক লাফে প্ল্যাটফর্মে উঠল, ছুটছে, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে সচল কনিং টাওয়ারের ওপর, রাগে চিৎকার করছে। কিন্তু ও যত জোরে দৌড়াচ্ছে, তারচেয়ে কনিং টাওয়ারের গতি অনেক বেশি।

প্ল্যাটফর্মগুলোর শেষ মাথায় টার্নিং বেসিন-এ জড়ো হলো তিনটে সাবমেরিন, প্রকাণ্ড ধাতব তিমির মত দেখতে, ঘুরন্ত প্রপেলার পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলছে। ওগুলোর ডেকে ছুটোছুটি করছে লোকজন, খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। কনিং টাওয়ারে দাঁড়ানো ক্যাপটেনরা পরস্পরের সঙ্গে কথা

বলছে, ইমার্জেন্সী বেল বেজে ওঠা সঙ্গেও কাউকে তেমন উদ্দিগ্ন দেখা গেল না, কারণ জানে একশো মিটার পানির তলায় নেমে যেতে পারলে কেউ তাদেরকে ছুঁতে পারবে না।

বেলের আওয়াজে কান ঝালাপালা, প্র্যাটফর্মের কিনারা থেকে নিচের দিকে তাকাল রানা। ভাঙাচোরা একটা ডিঙি নৌকা রয়েছে ওখানে, সিকি ভাগ পানি ভরা। তবে বৈঠা আর রো-লক আছে। ডুবু-ডুবু হলেও, ভেসেও আছে এখনও।

বোলার্ড-এর সঙ্গে রশি দিয়ে বাধা ওটা। রশি বেয়ে নামল রানা, নেমেই রশিটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল। মুক্ত হয়ে ছুটল নৌকা। রানা মরিয়া, মাথায় একটা আইডিয়া গজিয়েছে। হয়তো পাগলামি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জেদ-সাবমেরিনের কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে, হাসানকে বের করে আনতে হবে। কিভাবে? রানা জানে না। আগে সাবমেরিনটার পাশে পৌঁছুক তো। দরকার হলে খোলে বৈঠা ঠুকবে, ক্যাপটেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করবে সাবমেরিনের ভেতর ওর সঙ্গী, একজন ডক মেইট আটকা পড়েছে, তাকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হোক।

গায়ে শক্তি ফিরে এসেছে, দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে রানা। প্র্যাটফর্মের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল ও। স্রোতের মধ্যে পড়ল নৌকা।

স্রোতের গতি ঘণ্টায় চার নট। বৈঠা চালিয়ে ঘণ্টায় দুই নটের বেশি এগোতে পারত না রানা। কিন্তু সাবমেরিনগুলো চার নট নয়, আরও দ্রুতগতিতে নৌকাটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

হতাশায় ছেয়ে গেল মন। কোন আশা নেই। ধরে নেয়া চলে ইসরায়েলি সাবমেরিনগুলো সাইপ্রাসে পৌঁছে গেছে।

হৃদয়ে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে দিক বদল করল রানা, চ্যানেল ধরে আলবিদার দিকে এগোচ্ছে নৌকা। কয়েক মুহূর্ত পর বাতাসে চাবুক মারার মত আওয়াজ উঠল, মৃদু শব্দে কি যেন বিস্ফোরিতও হচ্ছে, আতসবাজির মত। কে যেন ওকে লক্ষ করে চিৎকারও করছে। একজন নয়, অনেক লোক চিৎকার করছে—খোলা সাগরে নোঙর করা জাহাজ দুটো থেকে। ওর চিন্তা ও কল্পনা শক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে। অস্পষ্টভাবে ধারণা করল হ্যাচ কাভারের ওপর বালির বস্তা ঘেরা বৃত্ত আছে, বস্তুর বাইরে বেরিয়ে আছে মেশিন গানের ব্যারেল। গুলি করছে ওরা। দূরত্ব যত বেশিই হোক, দু'একটা গুলি ওকে লাগতেও পারে।

কিছুই গ্রাহ্য করতে হচ্ছে করছে না। নিশ্চিতভাবে জানে এখন, হাসানকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

‘আমি হুকুমের দাস,’ শেষ সাবমেরিনের ক্যাপটেনকে বলল হাসান, রীতিমত চিৎকার করতে হচ্ছে, তা না হলে শুনতে পাবে না। ‘আর হুকুমটা আমাকে দিয়েছেন স্বয়ং জেনারেল। অফিসারদের টয়লেট চেক করে তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে। সাবমেরিন নিয়ে পাঁচ মিনিট পরে রওনা হন আপনি।’

ক্যাপটেন এত ক্লান্ত যে তর্ক করতে মন চাইল না। পাশে দাঁড়ানো একজন ক্রুকে বলল, ‘এই লোককে নিচে নিয়ে যাও। আমরা যখন রওনা হব, তার আগে ওকে যেন প্র্যাটফর্মে ফেরার সুযোগ দেয়া হয়। দায়িত্বটা তোমাকে দেয়া হলো।’

‘ইয়েস, স্যার।’ হাসানের দিকে ফিরল ত্রু। ‘কি চাও তুমি?’

‘এঞ্জিন রুমের টয়লেট।’ টুলবক্সটা ঝাঁকাল হাসান।

‘এঞ্জিন রুমে কোন টয়লেট নেই।’

‘আমি হুকুমের দাস,’ বলল হাসান।

‘নেই যে, চলো দেখিয়ে আনি,’ মই বেয়ে নামতে শুরু করল ত্রু। হাসান তার পিছু নিল।

করিডর ধরে সাবমেরিনের পিছনে চলে এল ওরা। কন্ট্রোল রুমের মাথার ওপর কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খোলা থাকায় দিনের আলো গোল থালার আকৃতি পেয়েছে। মই বেয়ে নামতে শুরু করেছে হাসান, মনে হলো কোথাও বেল বাজছে, লোকজন যেন চিৎকারও করছে। তবে সে জানে হাতে এখনও পাঁচ মিনিট সময় আছে। অ্যালার্ম-এর শব্দ তার জন্যে কোন তাৎপর্য বহন করে না। এই মুহূর্তে একটাই চিন্তা মাথায়, ত্রু ব্যাটাকে কিভাবে ভাগানো যায়।

ইতিমধ্যে সাবমেরিনের সেন্ট্রাল করিডর পরিচিত হয়ে উঠেছে—হলুদ আলো, উত্তাপ, ঘর্মান্ত চেহারা। পরিচিত নয় এঞ্জিনের আওয়াজটা। এ এমন এক গর্জন, বিরতি না নিয়ে ক্রমশ বাড়ছেই শুধু।

ত্রু দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে তাকাল হাসানের দিকে। কথা বলে লাভ নেই, কারণ শোনা যাবে না, তবু কিছু বলল সে। হাসান শুধু তার ঠোঁট নড়তে দেখল, কোন শব্দ শুনতে পেল না। তবে ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝতে পারল কি বলতে চায়।

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে ওঠায় ব্যথা অনুভব করল হাসান। ত্রু বলেছে, ‘আমরা রওনা হয়ে গেছি।’

বিশ্বয়ের আঘাতে নিম্প্রাণ কাঠের পুতুল হয়ে থাকল হাসান। মাত্র এক সেকেন্ড। তারপর নিঃশব্দে হাসল সে। ‘কি আর করা,’ জানে শুনতে পাবে না, তবু বলল। ‘তবে হাতে এখন প্রচুর সময়, কি বলো?’

এঞ্জিন রুমে ঢুকে ত্রু একটা হাত তুলে চারদিকটা দেখাল। ‘নেই,’ বলল সে। ‘এখানে কোন টয়লেট নেই।’

এখনও হাসছে হাসান, গোবেচারা লোকের বোকা বোকা হাসি। ‘হ্যাঁ, তাই তো, সত্যি নেই।’

করিডরের দিকে হাত তুলল ত্রু, ইঙ্গিতে মইটা দেখাল। হাসান বুঝতে পারছে, লোকটা তাকে ক্যাপটেনের কাছে পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব থেকে খালাস পেতে চাইছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে এঞ্জিন রুম থেকে বেরিয়ে এল ও, করিডরে পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল লোকটাকে। ব্যথায় গুড়িয়ে উঠে ডেকের ওপর ছিটকে পড়ল ত্রু।

করিডরে, একটু দূরে, আরও তিনজন লোক রয়েছে। কি ঘটছে দেখছে তারা।

ডেকে পড়ে গোল্ডাস্টে ত্রু, মোচড় খাচ্ছে, তাকে উপকে পিছন দিকে ফিরে এল হাসান, এঞ্জিন রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। ভেতরে দু’জন লোক রয়েছে, একজন অয়েলার, একজন এঞ্জিনিয়ার। এঞ্জিনের আওয়াজ এখন একটা পর্যায়ে স্থির। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ লোক দু’জন শুনতে পায়নি। পরস্পরের কাছ থেকে বেশ দূরে রয়েছে তারা, নিজেদের কাজে ব্যস্ত। টুলবক্স ডেকে নামিয়ে রাখল হাসান। চারদিকে চোখ বুলিয়ে একটা র‍্যাক দেখতে পেল, অনেক কিছুর সঙ্গে

তাতে একটা টুলবক্সও রয়েছে। ভেতরে হাত ভরে একটা স্প্যানার বের করল, এগিয়ে এসে দাঁড়াল এঞ্জিনিয়ারের পিছনে।

এঞ্জিনিয়ার কিছুই টের পেল না, ব্যথা পেলেও বেশিক্ষণ ভুগল না, এক সেকেন্ডের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকে। অয়েলারও তাই, জ্ঞান হারাবার আগে সে-ও টের পায়নি হাসানের উপস্থিতি।

অয়েলার চলে পড়ার পর দরজার দিকে চোখ পড়ল হাসানের। বাইরে থেকে ইস্পাতের কবাট খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। খালি হাতে ব্যর্থ হয়ে সম্ভবত স্নেজ হ্যামার ব্যবহার করছে লোকগুলো। হাসি পেল তার। স্নেজ হ্যামার দিয়ে বড়জোর হাতলটা হয়তো ভাঙতে পারবে, কিন্তু দরজা খুলবে না।

নিজের টুলবক্স থেকে দুটো গ্রেনেড বের করল সে। আর ঠিক সেই সময় তামাকের গন্ধ ঢুকল নাকে। সতর্ক চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, একটা ডিজেল ব্লক ঘুরে বেরিয়ে এল লোকটা, মুখে নিষিদ্ধ সিগারেট হাসানকে দেখে হাঁ হয়ে গেল লোকটা, এই নতুন মুখ আগে কখনও দেখেনি সে। দৃষ্টি নেমে এল হাসানের হাতে ধরা গ্রেনেডগুলোর ওপর।

হাসান হাসান, গ্রেনেড দুটো টুলবক্সে রেখে দিল আবার।

লোকটা এঞ্জিনিয়ার। চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। তবে বিপদের গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে নিজেকে সামলে নিতে পারল সে। সিগারেট ফেলে দিল, ভোজবাজির মত হাতে চলে এল একটা রেঞ্চ। সাবধানে হাসানের দিকে পা বাড়াল।

লোকটা খাটো, লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান, ইউনিফর্মের ভেতর থেকে পেশীগুলো ফুলে আছে। গায়ের জোরে এই লোকের সঙ্গে সে পারবে না, বুঝতে পারল হাসান। রেঞ্চটা দু'হাতে ধরে ক্রিকেট ব্যাট-এর মত ঘোরাল সে। পিছিয়ে এসেই আবার সামনে বাড়ল হাসান, সে-ও হাতের টুলবক্সটা দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল।

রেঞ্চ দিয়ে টুলবক্স ঠেকাল এঞ্জিনিয়ার। হাসানের হাত থেকে টুলবক্স ছুটে গেল, ডেকে পড়ে খুলে গেল ঢাকনি, টুলস আর গ্রেনেডগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। গড়ানো গ্রেনেডগুলোর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল হাসান। ওগুলো একটা টানেলের ভেতর ঢুকছে, যেখানে প্রপেলার শ্যাফট আছে। আক্রান্ত হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তড়াক করে লাফ দিয়ে সরে গেল, রেঞ্চটা লাগল স্টীল বাল্কহেডে, এক নিমেষ আগে যেখানে তার মাথাটা ছিল।

দরজার দিকে পিঠ, হাঁপাচ্ছে হাসান, বুকটা ধড়ফড় করছে। হলদেটে আলোয় লোকটার মুখের ঘাম ডিমের কুসুমের মত লাগছে। হঠাৎ তার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। কারণটা বুঝতে পারল হাসান। এঞ্জিন থেকে নতুন একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। যান্ত্রিক এক ধরনের আর্তনাদ। পায়ের নিচে ডেক ধীরে ধীরে কাত হচ্ছে।

যান্ত্রিক আর্তনাদটা ডিজাইন্টিগ্রেটার-এর। সাবমেরিন ডাইভ দিচ্ছে, ফলে এঞ্জিনে এখন ফুয়েল-এয়ার-এর বদলে ফুয়েল-ডিকমপোজড হাইড্রোজেন প্যারোব্লাইড সাপ্লাই পাচ্ছে।

রেঞ্চ হাতে লোকটা আবার এগিয়ে এল। রেঞ্চের নিচে মাথা নামিয়ে তার পেটে লাথি মারল হাসান। লাথিটা যেন পাথুরে পাহাড়ে লাগল, একচুল হেলল না এঞ্জিনিয়ার। হাসানকে পিছাতে দেখে আবার এগোল বেঁটে দানব।

দরজার কাছ থেকে ব্যাটাকে সরিয়ে আনতে হবে, ভাবল হাসান। তা না হলে বোল্ট খুলে দেবে, লোকজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ভেতরে।

আবার রেঞ্চ চালাল লোকটা। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল হাসান। দরজা বন্ধ থাক বা না থাক, সে মারা গেলে তার মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

লোকটা দরজার কথা ভুলে গেছে। হাসানই তার একমাত্র লক্ষ্য। এঞ্জিন রুমের প্রতিটি বাঁক আর কোণ সে চেনে, কাজেই জানে যতই পিছিয়ে যাক, এক সময় ঠিকই তাকে কোণঠাসা করতে পারবে, তখন খুন করা পানির মত সহজ হয়ে যাবে।

আবার এগোল লোকটা, হাসানের কোমর লক্ষ্য করে রেঞ্চ চালাল। লাফিয়ে সরে গেল হাসান। রেঞ্চটা দেয়ালের একটা পাইপে লাগল, ঠিক জয়েন্টের নিচে।

এঞ্জিন রুমের ভেতর হঠাৎ একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ওরা যেন একটা হেয়ারড্রেসার-এর সেলুনে রয়েছে।

এঞ্জিনিয়ারের চেহারা বদলে গেল। ভাঙা পাইপটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। চেহারা য় রাগ বা আক্রোশ কিছুই নেই এখন। আতঙ্কে বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে।

হাতে স্প্যানার নিয়ে সাবধানে এগোল হাসান। ভঙ্গি করল লোকটাকে মারবে, কিন্তু মারল পাইপে। পাইপটা আরও খানিক ভাঙল। চিৎকার করে কিছু বলতে গেল লোকটা, হাসানের স্প্যানার নেমে এল সরাসরি কপালে। খুলির হাড় ফাটার শব্দটা শুনতে পেল না হাসান, অনুভব করতে পারল।

লোকটা মারা গেছে।

জলদি!

পাইপ থেকে সগর্জনে প্যারোক্সাইড বেরিয়ে আসছে, এঞ্জিনিয়ারের শরীরের নাগাল পেতেই গলগল শব্দ করে বুদ্ধদ ছাড়তে শুরু করল।

আরও একটা ক্যাটালিস্ট আছে, হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইডকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করতে পারে। সেই ক্যাটালিস্টের নাম প্যারোক্সাইডেস। জিনিসটা মানুষের রক্তে পাওয়া যায়।

ছুটে এঞ্জিন রুমের পিছন দিকে চলে এল হাসান। প্রপেলার শ্যাফট গ্র্যান্ড-এর পাশে একটা কাবার্ড দেখতে পেল। ইস্পাতের দরজা লাগানো একটা লকার, গায়ে লেখা-গেইবি-গরম্যান। জলদি! জলদি! নিজেকে জোর তাগাদা দিচ্ছে হাসান।

ডেকের ওপর পড়ে থাকা বেঁটে দানবের সিগারেট এখন শুধুই আগুনের আভা ছড়াচ্ছে না, উজ্জ্বল ও নিরেটদর্শন শিখায় পরিণত হয়েছে।

গুলি লাগায় নৌকার চারপাশে পানি ছলকে উঠছে। বৈঠা হারিয়ে ফেলেছে রানা, স্রোতের টানে পাক খেতে খেতে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে নৌকা। সাবমেরিনগুলোও চ্যানেল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথম সাবমেরিন এরইমধ্যে পৌছে গেছে খোলা সাগরে। ওটাতেই হাসান আছে।

নৌকা পাক খাচ্ছে, দুনিয়াটাকে ঘুরতে দেখছে রানা। হেলাল জালনুর দিকে চোখ পড়তে একটা মাস্তুল দেখতে পেল, মাত্র এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে। চিনতেও পারল, ওটা আলবিদার মাস্তুল। মোবারকের বোট সরাসরি ওর দিকে আসছে।

অকস্মাৎ এক পশলা গুলি লাগল নৌকার গায়ে। পাটাতনের চিহ্নমাত্র থাকল না, পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে রানা। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। আলবিদা ওর পাশে চলে আসছে। স্রোতের উল্টোদিকে স্থির হবার চেষ্টা করল ও, ঘাড় ফেরাতেই একটা মাথা দেখতে পেল, আলবিদা থেকে পানির দিকে ঝুঁকে আছে। শামিমের মাথা।

শামিমের হাত দুটো লম্বা হলো। রানার কজি ধরে একটানে তুলে নিল বোটে। কাঠের একটা রেইল আকড়ে ধরল রানা, ভারসাম্য সামলাতে না পেরে আলবিদার নোংরা ডেকে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

‘ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড,’ বলল শামিম। ‘হাসান কোথায়?’

জাহাজগুলো থেকে মেশিন-গানের বুলেট ছুটে আসছে। হাত তুলে দেখাল রানা। সামনের সাবমেরিনের বেশিরভাগ পানির তলায় ডোবা, শুধু কনিং টাওয়ারের খানিকটা সারফেসের ওপর এখনও ভেসে আছে।

শামিমের চোখে বা চেহারায কোন ভাবাবেগ ফুটল না। আশ্চর্য এক অটল ভাব দেখা গেল শরীরে, যেন একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি। চোখ দুটো নিষ্পলক, তাকিয়ে আছে সাবমেরিনগুলোর দিকে। একটা একটা করে পানির তলায় ডুব দিচ্ছে ওগুলো।

এক সময় সবগুলো সাবমেরিন অদৃশ্য হয়ে গেল। নোঙর তুলে রওনা হলো জাহাজ দুটোও। খোলা সাগরের মুখে এক আলবিদা ছাড়া আর কোন বোট নেই।

শামিমের মত রানাও তাকিয়ে আছে খোলা সাগরে।

কোন বিস্ফোরণ ঘটছে না। পানিতে কোন আলোড়ন নেই।

‘রেডিও?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘মেসেজ পাঠানো হয়েছে?’ এখনও খোলা সাগরে তাকিয়ে আছে ও।

মাথা ঝাঁকাল শামিম, ‘লেবানন থেকে সাবমেরিন আসছে।’

মনে মনে একটা হিসাব কষছে রানা। জাহাজ দুটো রওনা হয়ে গেছে। ধরে নেয়া চলে ওগুলোর আশপাশেই, পানির নিচে, সাবমেরিনগুলো আছে। এখন যদি সাবমেরিনগুলো বিস্ফোরিত হয়, জাহাজগুলো অক্ষত থাকবে কি?

কিন্তু না, কোন বিস্ফোরণই ঘটছে না।

থ্রেনেডগুলো ওরা দেখে ফেলেছে, ভাবল রানা। থ্রেনেড দিয়ে সাবমেরিন ধ্বংস করবে, এটা আশা করাই তো বোকামি। হাত কাঁপছে, ওর আঙুলে একটা সিগারেট গুঁজে দিল শামিম। লাইটার জ্বলে ধরিয়েও দিল।

সিগারেটটা দাঁতে ধরা থাকল, রানা ধোঁয়া গিলছে না। অকস্মাৎ ওর চোখের সামনে খোলা সাগরের মুখ বিস্ফোরিত হলো।

প্রথমে পানিতে প্রায় কোন আলোড়নই জাগল না। সারফেস ভেদ করে সাদা শিখর বিশাল একটা স্তম্ভ মাথাচাড়া দিল, যেন আকাশ ছুঁতে চায়। তারপর বিপুল জলরাশি উথলে উঠল। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য লাগল রানার চোখে। আকাশ থেকে যেন একটা বিরতিহীন জলপ্রপাত ঝেঁমে আসছে। ছয়শো গজ দূরে আলবিদার ওপর গুরু হলো মুসলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির প্রথম ধাক্কাটা পার হতে দেখা গেল বোটের মাস্তুল বলে কিছু নেই। কুঠার হাতে রিগিং-এর মাঝখানে চলে গেছে শামিম, মাস্তুলের ভাঙা অংশ কেটে ফেলে দিচ্ছে সাগরে।

ওদের আরও একটু কাছে আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল, সদ্য নোঙর তোলা দুই

‘কেন?’ জানতে চাইল ও।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে বারবার রানা আর শামিমের দিকে তাকাচ্ছে নাসের। জবাব দিল শামিম, ‘স্ত্রী আর বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্যে।’ ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কেফার ভিটকিন পর্যন্ত লায়লাকে অনুসরণ করে। নাসের সহ আবার যখন লায়লাকে তারা গ্রেফতার করতে যাচ্ছিল, নাসের তখন তাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসে। ওই সময় তারা আমাদেরকে গ্রেফতার করেনি, তার অনেক কারণ। শুধু আমাদেরকে নয়, গোটা এলাকার হিবুল্লাহ আর মুসলিম ব্রাদারহুড গেরিলাদের তালিকা চেয়েছিল ওরা নাসেরের কাছে। নাসের সময় চায়। তাছাড়া, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দায়ান দায়ান বা ফিশ ফ্যাক্টরিতে কোনভাবেই আমরা পৌঁছতে পারব না। তবে চাইছিল আমরা যেন চেষ্টা করি, তাহলে হাতেনাতে ধরতে পারবে। কাজেই আমরা দায়ান দায়ান পৌঁছবার পর নাসের তাদেরকে তথ্য পাচার শুরু করে।’

কাঁধ ঝাঁকাল নাসের। ‘কাজটা আমি আমার স্ত্রী আর সন্তানের জন্যে করেছি,’ বলল সে। মুখ থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। মারা গেল পরমুহুর্তে।

হ্যাচ থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আছে লায়লা। তাকে ক্লান্ত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে। চোখের নিচে কালি। টপ টপ করে পানি পড়ল দু’ফোঁটা। ‘যাদেরকে ভালবাসত, তাদের সবাইকে হারিয়েছে ও,’ রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে বলল সে। ‘থাকার মাধ্য ছিলাম শুধু আমি আর আমার পেটে ওর বাচ্চা। কেউ যদি ভাবেন, নিজের দেশকে ও ভালবাসত না, তাহলে সেটা অন্যায় হবে। আমার স্বামী বলে বলছি না, ওকে চিনি বলে বলছি, এমনভাবেও বাঁচত না ও—অপরাধবোধ ওকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করত।’

শাফি বলল, ‘যুদ্ধে এরকম হয়। আগেও ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। তবে একথাও ঠিক যে বেঙ্গমান বেঙ্গমানই।’

লায়লা বলল, ‘যে যার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি আর অবস্থান থেকে সব কিছু বিচার করে। শাফি, নাসেরকে তোমার বোঝার কথা নয়। তোমার স্ত্রী আর সন্তান নেই। তোমার স্ত্রী বা সন্তান যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েনি।’

শামিম আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

রানার দিকে তাকাল লায়লা। ‘নাসের যা করেছে আমি তা সমর্থন করি না। কিন্তু সে আমার স্বামী। আমি তার সন্তানের মা। আমি জানি কেন কাজটা করেছে সে। এখন আপনিই বলুন, নাসেরকে আমি কিভাবে ঘৃণা করব?’

এ-ধনের প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দিতে হয় রানার জানা নেই।

দেড় ঘণ্টা পর খোলা সাগর থেকে একটা লেবাননী সাবমেরিন আলবিদা থেকে ওদেরকে উদ্ধার করল।

সাবমেরিনের পাশে ভিড়ল বোট। কনিং টাওয়ারে একজন লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশে স্যুট পরা সোহেল আহমেদ।

আলবিদা থেকে রানা জানতে চাইল, ‘তোদের সঙ্গে স্ট্রচার পার্টি আছে?’

‘কেন, কেউ আহত হয়েছে নাকি?’ উদ্বেগ দেখাল সোহেলকে।

‘না, ঠিক আহত নয়,’ জবাব দিল রানা।

আলবিদার ভাঙাচোরা ডেকে নামল স্ট্রোচার পার্টি। হাত তুলে তাদের বাক্করুমটা দেখিয়ে দিল রানা। সাইরেনের মত তীক্ষ্ণ একটা বিরতিহীন চিৎকার ভে আসছে সেদিক থেকে। স্ট্রোচার পার্টির চার্জে রয়েছে একজন পেটি অফিসার, নার্স ভঙ্গিতে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। কথা না বলে হাসল রানা।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার জানতে চাইলেন, ‘লাঞ্চ রেডি করতে বলে দি কেমন? সব মিলিয়ে আপনারা পাঁচজন, তাই না?’

‘হুঁ,’ বলল রানা।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার ভুরু কঁচকালেন। ‘কিন্তু আপনাদের শেষ রেডি মেসেজে জানিয়েছেন একজনকে পাওয়া যায়নি বা হারিয়েছেন।’

‘মানুষ মরে,’ জবাব দিল হাসান। ‘আবার মানুষ জন্মায়ও।’

বাক্করুম থেকে বেরিয়ে এল স্ট্রোচার। ওটার পিছনে শাফিকে দেখা যাচ্ছে স্ট্রোচারে শুয়ে রয়েছে লায়লা, স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। তার বুকে, ঠা কন্ডল দিয়ে জড়ানো, ছোট্ট একটা পোঁটলা। ওই পোঁটলার ভেতর থেকে সাইরেনের আওয়াজ আসছে।

লেফটেন্যান্ট-কমান্ডার একা নয়, সোহেলও কনিং টাওয়ারের রেইলিং আঁক ধরল। ভদ্রলোক বললেন, ‘ও, এতক্ষণে বুঝলাম!’

‘সময়ের আগে চলে এল,’ ক্ষীণ, সলজ্জ হেসে বলল লায়লা; তবে গভীর ভাবটুকু গোপন করতে পারল না। ‘আশা করি আপনাদের ঝামেলায় ফেললাম না কি যে বলেন! আমরা খুশি। খুশি কি, আনন্দে আত্মহারা!’

সুন্দর রঙ করা সাবমেরিনের ডেকে হেঁটে এল ওরা। একজন লেফটেন্যান্ট ওদেরকে ছোট, তবে পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ডরুমে নিয়ে এল। সোহেল নিজের হাতে ওদে সবাইকে ধুমায়িত কফি পরিবেশন করল। তারপর রানার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বলল, ‘বস্ মেসেজ পাঠিয়েছেন।’

চোখ বুজল রানা, কাগজটা ফেরত দিল সোহেলকে। ‘তুই পড়।’

সোহেল পড়ল, ‘শান্তি মিশন সফল হওয়ায় তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন এই সাবমেরিন লেবাননে ফিরবে না, সরাসরি বঙ্গোপসাগরে চলে আসবে। ঢাকায় ফিরেই রিপোর্ট কোরো। আরও একটা জরুরী অ্যাসাইনমেন্ট। রাহাত খান।’

‘কি? আরও একটা...’ কথা শেষ করতে পারল না, চেয়ারে বসেই ঘুংঘে পড়ল রানা।
